আলোকের ঝর্ণাধারা

নুরুল মোমেন

আলোকের ঝর্ণাধারা

নূরুল মোমেন

ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

আলোকের ঝর্ণাধারা
নূরুল মোমেন

ইসাকেরা প্রকাশনা : ৫৫
ই. ফা. প্রকাশনা : ৮৯৯
ই. ফা. গ্রন্থাগার : ইসলামী প্রবন্ধ / ২৯৭·০৪

প্রথম প্রকাশ :
শাবান ১৪০২
জুন ১৯৮২
জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯

প্রকাশনায় :
ইসলামিক ফাউণ্ডেন বাংলাদেশ-এর পক্ষে
মাসুদ আলী, পরিচালক
ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রাজশাহী

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে :
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রেস
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

মূল্য : ১৫·০০

ALOKER JHARNADHARA : A compilation Essays on Islam by Nural Momen in Bengali, published by the Islamic Cultural Centre, Rajshahi on behelp of Islamic Foundation Bangladesh, Dacca.

PRICE Tk. 15·00 U.S. DOLLAR 2·00

উৎসর্গ

আমার আব্বা /
মরহুম জনাব নূরুল আরেফিন
ও আম্মা /
মরহুমা জনাব সৈয়দউন্নিসা খাতুন
আমার শ্বশুর /
মরহুম জনাব অজিহ্উদ্দিন আহম্মদ
ও আমার শ্বাশুড়ী /
মরহুমা জোবেদা খাতুনকে

কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও গভীর ভালবাসার প্রতীক হিসাবে দিলাম, যাঁদের কাছে আমি দেশ, মানুষ ও গরীব-দুঃখীকে ভালবাসতে শিক্ষা লাভ করেছিলাম, এবং সে শিক্ষা ছিল গভীরভাবে ধর্মনিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত।

শুকরিয়া

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র এ. জেড. এম. শামসুল আলম, মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ-এর অনুরোধক্রমে আমার বহু লেখা থেকে ইসলাম সম্বন্ধীয় কিছু লেখা বাছাই করতে গিয়ে, এই ধরনের এতগুলো লেখা পেয়ে, এবং সেগুলো আলাদা একটি সংকলনে প্রকাশ করার অবকাশ পেয়ে, আমি শুধু আনন্দিতই হইনি; বিস্মিতও হয়েছি এই দেখে যে, আমার অবচেতন মনে আমি ইসলাম সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিরিখে এতটা চিন্তা করেছিলাম। সুতরাং এই সংকলনের জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আর এই সঙ্গে স্মরণ করছি আজাদের কর্তৃপক্ষকে, বিশেষ করে জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ, জনাব জয়নুল আনাম খাঁ ও জনাব মহীউদ্দিন আহমদ-কে; যাদের অনুরোধে সুদীর্ঘ সময় আমি প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত-ভাবে 'দৃষ্টি অন্যতরো' কলামে আজাদে এগুলো লিখি, যদিও লেখার তাগিদে যখন যা মনে এসেছে লিখেছি, যার ফলে প্রবন্ধ বিশেষে এক কথা দু'বারও বলা হয়েছে, তবুও আজাদে বলেই বোধহয়, এত-গুলো প্রবন্ধ আমার অজ্ঞাতসারেই এই রকম গভীর ধর্মীয় অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লিখিত হয়েছিল। সেজন্যে আমি সত্যিই আজ খুব সখী। সুতরাং তাদেরকে ও আজাদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা ক'রে এই সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

নুরুল মোমেন

প্রকাশকের কথা

'আলোকের ঝর্ণাধারা' কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন। নুরুল মোমেন সাহেবের এই প্রবন্ধগুলোর অধিকাংশই ইতিপূর্বে দৈনিক আজাদ পত্রিকায় 'দৃষ্টি অন্যতরো' নিয়মিত কলামে প্রকাশিত হয়েছিল। ইসলামের সামাজিক, অর্থনৈতিক, আধ্যাত্মিক বিবিধ দিকের উপর সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখকের উপস্থাপনা আশাকরি সকলকে আকৃষ্ট করবে—বইটি সকল মহলে আদৃত হলে আমাদের প্রচেষ্টা সফল হবে।

—মাসুদ আলী

সূচীপত্র

পূর্বাভাষ

এটা একটা অবিসংবাদী সত্য যে ইসলামের জন্ম ও সম্প্রসারণ একটি ঐতিহাসিক বিস্ময়।

ইসলাম যেভাবে টিকে গিয়েছিল এবং তার আকর্ষণ যেভাবে অনুভূত হয়ে অতি অল্প সময়ে সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়েছিল, তার ভিত্তিতে শুধু মানবিকতাই নয়, বিজ্ঞানও এমন কিছু নিশ্চয়ই ছিল যে জন্যে এই ধরনের আবেদন সৃষ্ট হয়েছিল। এই কথাটা চিন্তা করতে কোন প্রকার দার্শনিক কিংবা পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন যে কারও পক্ষে এটা বোধগম্য হওয়া উচিত।

ইসলামে এমন সব গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা চিরন্তন : অর্থাৎ সে সব গুণের আবেদন ব্যক্তিভেদে, অবস্থাভেদে, কালভেদে, দেশভেদে তখনও যেমন বর্তমান ছিল, আজও যেমন আছে, আগামীতে তাই থাকবে। তবে সেটা বোধগম্য হওয়ার জন্যে জ্ঞান, প্রচেষ্টা কিংবা সহানুভূতি যদি সজাগ না থাকে তবে বুঝতে নিঃসন্দেহে অসুবিধা হবে।

ধরুন, সব মানুষ এক, নারী ও পুরুষ ব্যক্তিত্বে ভিন্ন নয়—ইসলামের এই সামান্য একটা নীতি ধরলেই বোঝা যাবে : যে পর্যন্ত মানুষ কালো-সাদা হিসেবে পৃথক থাকবে, বড়জাতি-ছোটজাতি হিসেবে স্বাতন্ত্র্য অনুভব করবে, বড় লোক-গরীব লোক হিসেবে আলাদা অস্তিত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করবে, অহংকার বশে একে অন্যকে, কিংবা পুরুষ নারীকে, হীনচক্ষে দেখবে—সে পর্যন্ত ইসলামের চিন্তাধারা তাদের মধ্যে স্থিত হবে না এবং মুসলমানেরই শুধু নয়, অন্যেরও অনুসরনের অযোগ্য হয়ে থাকবে।

ইসলামে, খৃস্টীয় মতে যেমন, তেমন নয়। মানুষ সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কারণ সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবঃ আশরাফুল মাখলুকাত। সেই জন্যেই ইসলামে যদিও ভাগ্য রয়েছে আল্লাহ্‌র হাতে, তবুও সে ভাগ্য সম্পূর্ণ পূর্বনির্ধারিত নয়, বলা যায়, পূর্ব পরিমাপকৃত। এবং ক্ষেত্রবিশেষে মানুষ তা প্রায় কাজ ও প্রচেষ্টা দ্বারা পরিবর্তন করতে পারে। অর্থাৎ 'Islam does not beleive in pre-destination but in pre-measurement.'

সেই জন্যে সৎকাজ এবং তা করার প্রচেষ্টাকে ইসলামে ইবাদত বলে ধরা হয়, এবং সে কাজ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার জন্যে হলেও ঐ একই কথা।

এবং এই কাজ থেকে কেউ যদি কোন ফল আশা করে তা' হলে ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করতে হবে, এবং নিরন্তর কাজ চালিয়ে যেতে হবে। এবং কোন কাজকেই ছোট মনে করলে হবে না।

ইসলামের আদর্শের উল্লেখিত অতি সাধারণ দু'-একটি গুণ বিচার করলেই বোঝা যায়, কেন আদিতেই ইসলাম অন্যদের এত আকর্ষণ করেছিল। সেই অন্ধকার যুগে ইসলাম যে আলো এনেছিল, তারই ঝর্ণাধারায় সবাইকে ধুইয়ে দিয়েছিল।

সেই যুগে যিনিই যে ধর্মেরই হতেন না কেন, তাঁর সঠিক চলার ইঙ্গিত অনায়াসে ইসলামের আলোকেই শুধু পেতেন। এবং এই জন্যেই রোম সাম্রাজ্য আট শো বছরে যতদূর প্রসারিত হয়েছিল তার চাইতে বৃহত্তর এলাকায় ইসলাম প্রসারিত হয়েছিল মাত্র এক শো বছরে। এবং এটাই অমুসলিম ঐতিহাসিকদের গাত্রদাহের কারণ হয়েছিল। অমুসলিম চিন্তাবিদদেরও।

সুতরাং তারা যে ইসলাম সম্বন্ধে, হিংসায় দগ্ধ হয়ে চোখ বুঁজেই একরকম বিরূপ সমালোচনা করবেন, সেটা খুবই আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু আশা করা যায় নি যে, তাঁদের মধ্যেই আবার কেউ কেউ যেখানে সত্য না বলে উপায় নেই সেখানে, হযরত (সাঃ) ও ইসলামের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন। একজন সত্যিকার মুসলমানের জন্যে, কে কি বিরূপ সমালোচনা করলেন, তাতে যেমন কিছু আসে যায় না, তেমনি তাদের প্রশংসাতেও।

তবু তার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি এই জন্যে যে, আমাদের মধ্যে কিছু হীনমন্যতায় ভোগা লোক যে রয়েছেন, তাঁরা সেগুলো পড়লে দ্বিধায় পড়বেন এই মনে করে যে, মুসলমান হওয়ার ব্যাপারটা তত খারাপ নয়, যতটা তাঁরা মনে করেছিলেন।

বিভিন্ন মনীষীদের মতামত ইংরেজীতে দিচ্ছিও এই জন্যে যে, তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন সেটাই আপনারা দেখবেন এবং তাতে আপনাদের যা উপলব্ধি করার, তা নিজেরাই করবেন।

অমুসলিম ঐতিহাসিকদের লেখা ইতিহাস পড়তে গেলেই দেখা যায় যে, ওঁরা কলম ধরেই লিখে থাকেন, ইসলাম গায়ের জোরে যতটা সম্প্রসারিত হয়েছে, ন্যায়ের জোরে ততটা নয়। যদি গায়ের জোরেই অতটা করা যেত তা হলে রোম সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্য প্রসারিত করতে আট শো বছর লেগেছিল কেন? ন্যায়ের জোরই যে বেশী তা অনেকটা বোঝা যাবে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদের মন্তব্যে, তিনি তাঁর 'A Short History of Muslim Rule in India-তে লিখেছেন :

> To the down-trodden Hindu soceity in Bengal, Islam came as a message of hope and deliverance from the tyranmy of higher classes of Hindus.

পৃথিবীর সব জায়গাতেই এই ধরনের অত্যাচার বড়র থেকে ছোটরা পেত, তা সে, জাতের ব্যাপারেই হোক, কিংবা অন্য ব্যাপারেই হোক, সুতরাং ইসলাম যেন রোলার চালিয়ে সব সমান করে দিত এক নিমেষে। তাই তাঁরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতেন। এটাই একমাত্র কারণ হলে সেটা ইতিহাসে বেশী খাপ খায়।

ঐতিহাসিক Edward Gibbon তাঁর পুস্তক Decline and Fall of Roman Empire-এ যে কথা বলেছেন, আসল কথাটা কিন্তু সেই লাইনেই :

> The phenomenal suceess of Islam is due to uniqueness of its spiritual and social and political programme. The expansion of Islam is one of the most memorable revolutions which has impressed a new and lasting character in the nations of the world.
>
> Muhammad was the most faithful protector of those he protected, the sweetest and the most agreable in con-

versation. Those who saw him were suddenly illed with reverence ; those who came near him loved him ; those who described him would say, "I have never seen his like either before or after.

The creed of Muhammad is free from the suspicions of ambiguity, and the Koran is a glorious testimony to the unity of God. A Prophet or Apostle, inspired by Deity, can alone exercise lawful dominion over the faith of mankind."

এর থেকেই বোঝা যায় ইসলামের প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টির কারণগুলি কি ছিল।

শুধু কুরআনই যে আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল স্বয়ং Thomas Carlyle-এর ভাষায় তা এই :

Sinecrity in all senses, seems to me the merit of the Quran ; it is after all, the first and last merit in a book, gives rise to merit of all kinds—may at the bottom, it alone can give rise to merit of any kind.

এ ছাড়া কার্লাইল, অন্যদিকে ইসলামের উপর এক হাত নিলেও, হযরতের নির্দোষ চরিত্র, স্বল্প ভাষায় অদ্ভুত বক্তৃতা দেয়ার ক্ষমতা, শ্রমের মর্যাদাবোধ ইত্যাদির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এবং ঐতিহাসিক H. G. Wells-ও বলেছেন :

It was a simple and understable religion....Without any ambiguous symbolism, without any darkening of others or chanting of priests, Muhammad had brought home those attractive docrines to the hearts of mankind.

Islam created a soiciety more free from widespread cruety, social oppression than any soceity had ever been in the world before.

এই জন্যই সবাই ইসলামকে লুফে নিয়েছিল। জোরাজুরির ব্যাপার বড় একটা ছিল না।

আমরা আজকাল যে বিপ্লব বিপ্লব বলে চীৎকার করি সেটা আদিতে ইসলাম কিভাবে দিয়েছে তা লেনিনের সহকর্মী মিস্টার এম. এন. রায়ের ভাষায় এই :

Islam first of all introduced the idea of social equity. which was unknown in all the lands of anceint civilization ···The phnomenal succcess of Islam was primarily due to its revolutionary significance... Revolt of Islam saved humanity. Islam was a necessary product of history, an instrument of human progress.

এমন কি গুরু নানক এ পর্যন্ত বলেছেন ঃ

The age of Vedas and puranas is gone : now the Quran is the only book to guide the world.

ইসলামের এই ধরনের উচ্ছ্বসিত তারিফ আরও অনেকে যাঁরা করেছেন, তাঁদের করার কোন দায়িত্ব ছিল না। অর্থাৎ না ছিলেন তাঁরা ধর্মযাজক, না ছিলেন ঐতিহাসিক। যেমন তাঁদের মধ্যে কবি মিলটন, ডঃ জনসন, নেপোলিয়ান, এবং আরো অনেক মনীষা ছিলেন। নেপোলিয়ান তো বলেই ছিলেন ;

I hope time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform regime based on the principles of the Holy Quran which alone are true and which alone can lead men to happiness.

আমি বিশেষ করে নেপোলিয়ানের কথা বললাম এই জন্যে যে, সামর্থসম্পন্ন এবং নির্ভীকভাবে উচ্চস্তরের কাজ করার মত যদি কোন লোক কোন মতবাদকে চালু করতে চান তাহলে তাঁর হাতে তার অভুতপূর্ব সাফল্য আসতে পারে। যেমন কার্ল মার্কসের মতবাদ লেলিনের হাতে রাশিয়ায় গভীরভাবে সাফল্য লাভ করেছিল।

ইসলামী মতবাদ নেপোলিয়ানের হাতে আরও বেশী ফলপ্রসূ হতো, কারণ এর মধ্যে পরীক্ষা-নিরিক্ষার কিছু ছিল না ; তরতাজা ঐতিহাসিক জীবন সূত্র বর্তমান ছিল। সুতরাং ধর্ম-নিবিশেষে তা সবার গ্রহণযোগ্য ছিল।

নেপোলিয়ানের কথাটায় অবাস্তব কিছু ছিল না। কারণ কোন রকম বীর বা নেতা না হয়েও, জর্জ বার্নার্ডশ' ইসলাম ও হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা নেপোলিয়ানের আকাঙ্ক্ষাটাকে অর্থবহ করে। কারণ G. B. S. ইসলাম সম্বন্ধে বলেছেন ঃ

I believe the whole of the British Empire will adopt a reformed Muhammadanism before the end of the century.

এ কথাটা তিনি অবশ্য তাঁর নাটক 'Getting Married'-এর একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন; কিন্তু তাঁকে তা জিজ্ঞাসা করায় তিনি নিজেই তা বিশ্বাস করেন বলেছিলেন, এবং আরো বলেছিলেন:

I have always held the religion of Muhammad in h igh estimation because of its wonderful vitality.

সুতরাং হযরত সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ বিশ্বাসভরে বলেছেন:

I have studied him, the wonderful man and he must be called the saviour of Humadity. I belive that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world he would succeed in solving its' problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness.

এবং এই peace and happiness অতীতে ইসলামের নেতৃবৃন্দ দিতে পেরেছিলেন বলে ইসলামের জয়যাত্রা চলেছিল, ভবিষ্যতে কেউ পারলে আবার চলবে। ইসলামের নীতি-রীতি সবই ঠিক রয়েছে, বিশ্বভর অশান্তির আলামতও দেখা দিয়েছে এখন একজন এমন সত্যিকার শক্তিশালী লোক চাই, যিনি ইসলামের ধারা দিয়ে, বিশ্বশান্তি কায়েম করে ইসলামের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করতে পারেন। এই প্রসংগে বিশেষ করে sir Thomas Arnold-এর কথা অনুধাবনযোগ্য। তিনি বলেছেন:

Islam is a great Political power, whose effect the world will feel more and more in proportion as to ends of earth are brought closer and closer togather. Islam is the only solution for all the ills of the world.

—নুরুল মোমেন

রসূলে খোদা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (সাঃ) মানব জাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ; একথা পৃথিবীর বহু বিখ্যাত অমুসলমান মনীষী ও চিন্তাবিদ, যেমন ঐতিহাসিক গীবন, দার্শনিক আরনল্ড, নাট্যকার বার্নাড শ' প্রমুখ ব্যক্তিগণ নানা রকমে বলেছেন, কিন্তু যেমনটি করে ঐতিহাসিক ও জ্যোতিবিজ্ঞানী মাইকেল এইচ. হার্ট এ কথা তাঁর 'দি হাণ্ড্রেড' গ্রন্থে বলেছেন তেমনটি করে অন্য কেউ বলতে পারেন নি। অর্থাৎ তিনি বৈজ্ঞানিক ও জীবনভিত্তিক দৃষ্টি দিয়ে সত্যিকারভাবে উপলব্ধ সত্যকে বিনা দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন।

ব্যক্তিগত কৃতিত্ব বহু চিন্তাবিদ ও মহাপুরুষদের থাকতে পারে, কিন্তু তা মানব ইতিহাসে মানুষকে প্রাত্যহিক জীবনে হয়তো আশানুরূপ প্রভাবিত করতে পারেনি ; কিংবা কিছুটা করলেও সামগ্রিকভাবে করতে অক্ষম হয়েছে। কিন্তু হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর বেলায় তার পরিপূর্ণ সার্থকতা ঘটেছে। সেই জন্যেই তাঁকে মাইকেল হার্ট মানব জাতির সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বলে সকলের শীর্ষে স্থান দিয়ে যেসব মহাপুরুষ এবং মহাপুরুষস্বরূপ একশত জনের নাম দিয়েছেন, তার মধ্যে যীশু খৃস্ট বা হযরত ঈসা (আঃ)-এর নাম রেখেছেন তিন নম্বরে। হার্টের মতে, যীশুর চাইতে বিজ্ঞানী নিউটনের প্রভাব মানব জাতির উপরে অনেক বেশী। আর যীশুখৃস্টের নামে যে খৃস্টান মতবাদ আজ জগতে প্রচলিত, তার বিকাশ-প্রকাশ ও প্রচারে সেন্ট পলের অবদান যীশুখৃস্টের চাইতে কম নয়।

আমি মাইকেল হার্টের এই গ্রন্থ 'দি হাণ্ড্রেড' পড়িনি সংবাদে যা জেনেছি, তার উপর ভিত্তি করে আমার বক্তব্য যা' তা' আজ বলছি। ইচ্ছে ছিল তাঁর বইখানা পড়ে সে সম্বন্ধে লিখবো।

কিন্তু তা' করছি নে এই জান্যে যে, তাঁর বই পড়ে যে প্রতিক্রিয়া হবে সেই প্রেক্ষিতে লেখার অবকাশ তো রয়েই গেল। না পড়ে অর্থাৎ তিনি যে কারণে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার করেছেন। সেটা না জেনে, আমার নিজস্ব মতে ঐ ধরনের সিদ্ধান্তের কারণগুলির সামান্য কিছু দিয়ে যদি আমার বক্তব্য দাঁড় করাই, তা'হলে মাইকেল হার্টের কারণগুলোর সাথে তার যতটা মিল হবে সেটা গভীরভাবে মিলে যাবে বাইরের একজন নির্লিপ্ত ব্যক্তির বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে। শ্রেষ্ঠত্বের কারণ সেজন্যে তো থাকবেই; অধিকন্তু যেটা হবে সেটা হবে গণ্ডীর মধ্যকার একজনের উপলব্ধ জ্ঞানের বৈজ্ঞানিকভাবে অধিকতর বেশী প্রকাশ।

এমনও হতে পারে যে, হযরতকে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে তাঁর যে যুক্তি সেটা সাধারণত গ্রহণযোগ্য হলেও তা আমার জন্যে সরাসরি গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে; কিংবা বিচারের দৃষ্টিকোণের তফাতও হতে পারে। তবে আশা করি বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে যখন তিনি সমগ্র বিচার করছেন বলে প্রকাশ, তখন দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তিতর্কের তারতম্য হলেও মোটামুটি বিচারের ধারা একই খাতে প্রবাহিত হবে আশা করা যায়। হার্টের এই তালিকায় ধর্মীয় মহাপুরুষ তৃতীয় স্থানে শুধু যীশুখৃস্টই নন, চতুর্থ স্থানে বুদ্ধ, পঞ্চম স্থানে কনফুসিয়াস এবং ষোড়শ স্থানে মূসা (আঃ) ও নিরানব্বইতম স্থানে মহাবীর রয়েছেন এবং ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে সেন্ট পলকে ষষ্ঠ ও হযরত উমর (রাঃ)-কে একান্নতম স্থানে স্থাপিত করা হয়েছে।

স্রেফ ধর্মীয় নেতাদের এই ক'জনের স্থান নির্দিষ্ট করার উপরই মাইকেল হার্টের মনের যে ধারা আমি অনুভব করেছি, আমার মনে হয় আমার মনের ধারা তার অনুরূপ না হলেও কাছা-কাছি হতে পারে, যদিও কেমন কাছাকাছি হবে তার সঠিক হদিস তাঁর ঐ পুস্তকখানা পাঠ করার পূর্বে লাভ করতে পারবো না।

একটা সামান্য কথা বললে হার্ট কতটা বিচক্ষণ তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। ধরুন যীশুখৃস্ট অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) বাইবেল সূত্রে উপদেশ দিয়েছেন যে 'তোমার ডান গালে চড় দিলে বাঁ গাল ফিরিয়ে দিও!' এটা কখনও ব্যবহারিক কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ

করা সম্ভব নয় ; কারণ তা হলে সত্যিকার ধার্মিক জীবন অচল হয়ে পড়বে। আবার হযরত মুসা (আঃ)-এর 'দাঁতের বদলে দাঁত' এই ধর্মীয় নীতিও সংসারে অচল।

এইস্থলে ইসলামের বিধান সূরা বারাআতে যা রয়েছে সেটা শুধু এ ক্ষেত্রে প্রকৃষ্টই নয়, সারা সভ্য জগতের আজকালকার আইন। সেটা হলো—অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিহত করার জন্যে বলপ্রয়োগের কথা। এই অত্যাচার প্রতিহত করার জন্যে শুধু ততটুকু বলপ্রয়োগ করা আইনানুগ হবে, যতটুকু দ্বারা সেটা রোধ করা যায়। এর অধিক বল প্রয়োগ অবৈধ হবে।

এটা আমি একটি সাধারণ ধরনের উদাহরণ দিলাম মাত্র। যার দ্বারা এটুকু বোঝা সম্ভব যে, খৃস্টান, ইহুদী ও মুসলমান এই তিন ধর্মের লোকদের যদি নিবিড়ভাবে ধর্মানুসরণ করে সাধারণ মানুষের মত বাঁচার চেষ্টা করতে হয়, তা'হলে সে চেষ্টায় একজন মুসলমান সর্বাপেক্ষা বেশী ধর্মীয় নীতির সাহায্য পাবে। ধরতে গেলে একজন মুসলমানের সাধারণ ও ধর্মীয় জীবন পালনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তার ধর্ম পালনটাই যেমন জীবন যাপনের মতো; তেমনি জীবন ঠিকভাবে প্রতিমুহূর্তে কাটানোও ধর্ম পালনের স্বরূপ। অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে বিশেষভাবে ডাকাও যেমন ইবাদত, তেমনি জীবন যাপনের প্রত্যেকটি কাজ যেটা ন্যায়তঃ জীবন যাপনের জন্যে করতে হয় সেটাও ইবাদত। এবং এটাই ইসলামকে এতটা বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক এবং এতটা সহজে একটি মানুষের ধর্মে পরিণত করে মানুষকে যেভাবে এর আশ্রয়ে টেনে নিয়ে এসেছে তাতেই হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-কে সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বলে মাইকেল স্বীকার করেছেন। সুতরাং এই স্বীকার তাঁর বিচক্ষণতার সূক্ষ্ম প্রকাশ বলে আমি মনে করি।

এই একশত ব্যক্তিত্বের মধ্যে অন্যান্যের মধ্যে রয়েছেন---আইজাক নিউটন (২), কিস্টোফার কলম্বাস (৯), কার্লমার্কস (১১), গ্যালিলিও (১৩), লেনিন (১৫), মাওসেতুং (২০), আইনস্টাইন (১০) এবং লুই পাস্তুর (১২)।

মাইকেল হার্টের মতামতের অন্যকিছু না জেনে শুধু এই স্থান নির্দেশের প্রেক্ষিতে তাঁর মনের যে সূক্ষ্ম যুক্তিগুলি এর মধ্যে আচ্ছন্ন বলে ধরা যায়, সেটা আমার কাছে মনে হয় অত্যন্ত বিচক্ষণ।

একটা উপমা দিলে বুঝবেন। বর্তমানে আপনি ধরুন সাত-আটজন বিভিন্ন ধরনের অত্যন্ত সৎ ব্যক্তিকে খুব ভাল করে জানেন, আপনার কোন একটি লোকের সঙ্গে দেখা হলো; তিনি ঐ ব্যক্তি-দের সম্বন্ধে বিস্তারিত কিছু না বলে তাঁরা কে কত ভালো সেটাই তাঁদের স্থান নির্দেশ করে বলে গেলেন শুধু। এখন এই স্থান নির্দেশের সংগে আপনি যদি একমত হন, কিংবা না হলে একমত হওয়ার চেষ্টা করেন তা' হলে দেখবেন তার চিন্তাধারার মধ্যে আপনি একটি আলো দেখতে পাচ্ছেন; এবং তার মধ্যে তার বিচক্ষণতাও দৃষ্ট হচ্ছে।

এবার একটা কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজন। লুশধক এই সংবাদের উপর চমৎকারভাবে লিখিত একটি রচনা এই বলে শুরু করেছেন যে, প্রতিবাদ করছি দুনিয়ার সর্বাধিক প্রচারিত ধর্ম ইসলামের নবী (সাঃ)-কে সাধারণ পর্যায়ে নামিয়ে আনার বিরুদ্ধে। যদিও শেষ সিদ্ধান্ত বা বিচার-বিবেচনায় মহানবী (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুন্ন রয়েছে (অক্ষুন্ন থাকবেই, থাকতে হবেই; না হলে সে বিচার সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত হবে না) তবুও এ ভাবের এক পর্যায়ের বিচারে ধর্মপ্রাণ মানুষের ভাবাবেগ আহত হতে পারে।

সত্যি কথা। কিন্তু হযরত (সাঃ)-কে সত্যিকারভাবে বুঝতে হলে, তাঁকে মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনতেই হবে, কারণ আল-কুরআনে রয়েছে---বল, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে তোমাদিগের ইলাহ, একমাত্র ইলাহ। আল্লাহ-ই যে একমাত্র ইলাহ্‌হ সেটা প্রকাশের জন্যে ওহী নাযিল হয়েছিল হযরত (সাঃ)-এর উপর এই মাত্র। না হলে তিনি আমাদের মতই মানুষ। এবং তিনি মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন বলেই আজ ইসলাম মানুষের জন্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

এবং ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিচার করে বিশ্বের সর্বাধিক লোক দ্বারা জীবনায়নের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করানোর কৃতিত্বের জন্যেই তাকে মাইকেল হার্ট পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বলে স্বীকার করেছেন।

এবং তাঁর এই স্বীকৃতি দেয়াটা বৈজ্ঞানিক মতে কোনরূপ কষ্টকর ব্যাপার হওয়ার কথা নয়। কারণ হযরত (সাঃ) দৈনন্দিন

জীবনে যেভাবে কাজ করে গেছেন, ইসলাম কিংবা হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, এবং সে কারণে বিতশ্রদ্ধও, যদি কেউ তাঁর নিজের অজান্তে অন্যের পরামর্শক্রমে ঐ সব কার্যাবলী অনুসরণ করেন, তা হলে তার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর দৈনন্দিন জীবন যাপন করে যে শারীরিক, মানবিক ও আত্মিক সমৃদ্ধি ও শান্তিলাভ করবেন তা তাঁর কাছে অভূতপূর্ব বলে মনে হবে, যদিও তিনি ইসলাম ও হযরত সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকবেন।

এটা আমি গায়ের জোরে বলছি না। হযরতকে অনুসরণ করে মুসলমান হিসেবে আমি কাজ করে সন্তুষ্টি লাভ করি, অন্য ধর্মাবলম্বী হয়ে কেউ ঐ কাজ ঐভাবে করলেও ঐএকই ধরনের সন্তুষ্টি লাভ করার কথা, এ আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।

দৈনিক আজাদ
২৭. ৮. ৭৮

ভারত বিভাগের পূর্বে আমি যখন সর্বপ্রথম আজমীর শরীফে খাজা গরীব নেওয়াযের মাযার যিয়ারত করতে যাই তখন ঢাকা থেকে একজন শাহ সাহেব আমার মেজবানদারির জন্যে সেখানকার একজন খাদেমের কাছে একখানা চিঠি দেন। শাহ সাহেবকে আমি খুব পসন্দ করতাম না, কারণ তিনি অন্যের উপর নির্ভর করেই সংসার চালাতেন। তাঁর চিঠি নিয়েছিলাম, কারণ সেখানে তখন আমার অন্য কেউ জানা ছিল না।

সেখানে গিয়ে খুঁজে খাদেমকে বের করলাম তারপর সেখানে তিনদিন থেকে তাঁকে যে টাকা দিলাম তাতে তিনি খুশীতো হলেনই বিস্মিতও হ'লেন এবং আমাকে বিদায় দেওয়ার জন্যে স্টেশন পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন।

স্টেশনে এসে ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠতে দেখে আরও আশ্চর্য হলেন যেন। এবং বলেই ফেললেন আমি জানতাম না, আপনি এত উচ্চ স্তরের লোক। আপনি যে শাহ সাহেবের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এসেছিলেন তিনি আমাদের সবার গলগ্রহ ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আমাদের কারও উচ্চ ধারণা ছিল না; তাঁকে আমরা বরং কৃপার চক্ষেই দেখতাম। তাই তাঁর কাছ থেকে চিঠি আনাতে আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা নিচে নেমে যেতে বাধ্য হয়েছিল, আপনি মাফ করবেন। এই বলে তিনি আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি খুব লজ্জা পেলাম, কারণ তিনি যথেষ্ট খাতির করেছিলেন। পরে অবশ্য দেখেছি সঠিক পরিচয়ে ওঁর ঐ খাতির আরো কতো উঁচুদরের হতে পারে!

ইসলামকে আমরা যারা পরিচিত করছি সেটা ঐ শাহ সাহেব আমাকে যে রকম পরিচিত করেছিলেন সেই ঢপেরই।

সুতরাং যাদের কাছে পরিচিত করছি, তাদের মনোভাব ঐ খাদেমের মতই। ইসলামী বিশেষজ্ঞ কমিটির কথা শোনা যাচ্ছে। বিশেষজ্ঞগণ তো বহুদিন থেকে আমাদের মধ্যে আছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইসলাম যে মুসলমানদের মধ্যেই খুব সুবিধে করছে তা মনে হয় না, অমুসলমানদের তো কথাই নেই।

ইসলামের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার কী যে অভিনব তরীকা থাকতে পারে তার কিছু দেখিয়েছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডাঃ সুধীশ রায় প্রায় চল্লিশ বছর আগে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ল' কলেজে ভর্তি হয়েছি। শুনলাম পুরাতন মুসলমান অধ্যাপক যিনি মুসলিম আইন পড়াতেন, দ্বিতীয় বর্ষের কোন বিষয় পড়াবেন। তাঁর জায়গায় ডাঃ সুধীশ রায় আমাদেরকে পড়বেন মুসলিম আইন। দ্বিতীয় বর্ষের ছেলেরা বলল, তোমরা ভাগ্যবান। লোকটি জীবনে দ্বিতীয় হননি। এম. এ-তে ইতিহাসে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। ব্যারিস্টার এট-ল। তদুপরি ইতিহাসে পি-এইচ ডি। পড়ান অদ্ভুতভাবে।

প্রথম দিনের কথা। ডাঃ সুধীশ রায় ঢুকলেন। রেজিস্ট্রি খাতাটা রেখে হঠাৎ সকলকে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমরা কি ভগবানে বিশ্বাস কর ?" সকলে আশ্চর্য হয়ে বললো "হ্যাঁ স্যার।" তখন তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "তা হলে কতটি ভগবান আছে বলো।" সবাই আশ্চর্য হয়ে বললো কেন স্যার ? ভগবান এক। "ভগবানের অবতার কত ?" —তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। অনেকেই বললো "তেত্রিশ কোটি।" তিনি তখন বললেন "এতো তোমরা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো ?" সবাই হ্যাঁ বললো

তিনি তখন বললেন, "অবতার হলেন তিনি যিনি স্বয়ং ভগবানের দেহধারণ করেন; সেটা যখন তোমরা বিশ্বাস করো তখন কেউ যদি বলেন তিনি মানুষ, শুধু ভগবানের বার্তাবহ মাত্র ; তা হলে তাকে বিশ্বাস করবে ?" সকলে বললো "হ্যাঁ, স্যার নিশ্চয়ই।"

ডাঃ সুধীর রায় তখন হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "তিনি যদি হযরত মুহম্মদ হন তা হলে ?" সবাই বললো তা হলেও বিশ্বাস করবো।" সবাই বললো মানে আমি ছাড়া ক্লাসের বাকী ৩৯ জন, সবাই হিন্দু ছিল, তারাই বললো।

তখন তিনি এক ছকে প্রশ্ন দুটি একত্র করে জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবান এক এবং হযরত মুহম্মদ তার বার্তাবহ। সকলে বললো 'হ্যাঁ।' তখন তিনি বললেন, তোমাদের কেউ যদি কোন কোর্টে গিয়ে ঐ দুটো কথা স্বীকার করো তা হলে তাকে মুসলমান বলে ধরা হবে।

তখন একজন বললো, "তাহলে মুসলমানদের সংজ্ঞা কি এতই বিস্তৃত ?"

তিনি বললেন, "ধরতে গেলে সব মানুষের অন্য মানুষ হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হতে কোন বাধা নেই।"

এই বলে তিনি বললেন, "তোমরা কতদূর অন্য মানুষ ও কতদূর মুসলমান দেখছি।"

তারপর খড়িমাটি হাতে নিয়ে তিনি ব্লাক বোর্ডের কাছে গেলেন এবং এক এক করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন।

"ধরো তুমি মরার কথা চিন্তা করছো তা হলে তোমার সম্পত্তি কারা কারা পাবে তোমার মন তা চাইবে ?"

যাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন সে বললো, "স্যার আমার মন চাইবে, আমার মা ও বাবা সব পান ?"

"ভাইবোন ?" "না স্যার, শুধু মা ও বাবা।" ডাঃ রায় হেসে বললেন, "ও তুমি বিয়ে করোনি বুঝি ?" ছেলেটি লজ্জা পেয়ে বললো "না স্যার।" "আচ্ছা বিয়ে করলে কি ইচ্ছে হতো স্ত্রী কোন অংশ পাবে ?" সে বললো "হ্যাঁ স্যার, কিছু তো পাওয়া উচিত।" কত ? এই বলে ডাক্তার রায় সম্পূর্ণ ক্লাসকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা-মা রয়েছেন, বলো স্ত্রী কত পেলে ঠিক হয় ?" সকলে বললো "বার আনা মা-বাবা চার আনা মাত্র স্ত্রী।" ডাঃ সুধীশ রায় এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "মা এবং স্ত্রীকে দিতে চাইছো কেন ? তারা তো মেয়ে মানুষ তাদেরকে কি কোন সম্পত্তি পেতে দেখেছো ? বিশেষ করে বাপ যেখানে বেঁচে রয়েছেন ?" সকলে বললো "মেয়েদের অমন কোন অধিকার নেই বটে কিন্তু সে অধিকার দেয়া উচিত।"

"বেশ তাহলে কত দেবে মাকে ? স্ত্রীকে যতটা ততটা ?" সকল পরামর্শ করে বললো "বাবা যখন রয়েছেন তখন মাকে কম করে কিছু দেয়া যেতে পারে। বাদ দেয়া যাবে না, তাই সবার মতে ঠিক হলো

১/৬ অংশ মার।" হঠাৎ ডাঃ একজন বয়স্ক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মনে হয় ছেলেমেয়ে রয়েছে। আপনার কি মত? ছেলে-মেয়ে কিছু পাবে? সকলে এক জোটে বললো "সেতো পাবেই স্যার। মা-বাপ ও স্ত্রীকে সামান্য কিছু কিছু দিয়ে বাকীটা তো ছেলেমেয়েরই পাওয়া উচিত।" "সমান সমান?" সকলে বেশ একটু দ্বিধাভরেই বললো, "বেশী হয়ে যায় স্যার। মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক পেলে ঠিক হয়।" বেশ ঠিক আছে। তা হলে মা-বাপ-স্ত্রী এরা কে কত পাবে? এদের প্রত্যেকে ১/৪ অংশ? সকলে সমস্বরে বললো "না স্যার, বেশী হয়ে যায়, ছেলে-মেয়েদের কিছুই থাকে না প্রায়।" "তা হলে?" জিজ্ঞাসা করলেন স্যার। ছেলে-মেয়ে রয়েছে যখন তখন স্ত্রীকে আট ভাগের এক ভাগ মাত্র দেয়া ঠিক হলো। বাবা-মাকে দেয়া হলো বাকীটা ছেলে-মেয়ে এরা থাকতে অন্য কেউ পাবে না, সবাই তাই বললো।

ডাঃ সুধীশ রায় বোর্ডে সকলের মতৈক্য এইভাবে লিখলেন ঃ বাবা ১/৬, মা ১/৬, স্ত্রী ১/৮ ছেলে-মেয়ে বাদবাকী সব। ছেলে মেয়ের ডবল। এরা সব থাকতে আর কেউ কিছু পাবে না। লিখে এবার বললেন, "তোমরা মেয়েদেরকে মা, স্ত্রী ও কন্যা হিসেবে যে অধি-কার দিচ্ছ তা তাদের তো নেই। এমন কি পিতাকেও যে অধিকার দিচ্ছ ছেলে বর্তমান থাকলে সে অধিকার সে তেমনি করে পায় না, তাহলে দিচ্ছ কেন?"

সকলে বললো "এটাই ন্যায্য। এটাই আমাদের করা উচিত। মেয়েদেরকেও অধিকার দিতে হবে। পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে, এখন ওদেরকে বঞ্চিত করা চলবে না।"

তখন ডাক্তার সুধীশ রায় বললেন, "পৃথিবী এতটা এগিয়ে গিয়ে-ছিল তখনই, যখন নিরক্ষর হযরত মুহম্মদ (সাঃ) ঠিক তেরশত বছর পুর্বে, আজ তোমাদের মত বি.এ. পাশ করা চল্লিশজন ছাত্র একত্রে বসে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছো সে সিদ্ধান্ত ঐশ্বরিক সুত্রে পেয়েছিলেন। তাহলে দেখছো তোমরা অন্য মানুষ হয়েও আসলে মুসলমান।"

আমাদের সঙ্গে টিকিধারী একটি গোঁড়া হিন্দু ছেলে ছিল, যার বোধ হয় সহ্য হচ্ছিল না, সে হঠাৎ বললো "তিনি অনেকগুলি বিয়ে করেছিলেন, সেই জন্যেই তো ভক্তি আসে না।" ঐতিহাসিক ডঃ

সুধীশ রায় এটাই যেন কেউ বলুক—চেয়েছিলেন ; সুতরাং উদ্দীপ্ত হয়ে হযরতের বিয়ে সম্বন্ধে আলোচনা করলেন ; ইসলামকে টিকিয়ে রাখার জন্যে কাকে বিয়ে করেছিলেন, কাকে বিয়ে করেছিলেন সেই জাতিকে মর্যাদা দেয়ার জন্যে, কাকে বিয়ে করেছিলেন শুধু সাহায্য করার জন্যে, এইসব বলে বললেন, "কোন বিয়েই তিনি প্রবৃত্তির বশে করেন নি, কারণ তারা সবাই ছিলেন বিধবা, একমাত্র বিবি আয়েশা ছাড়া ; তাঁরও বয়স বিয়ের সময় ছিল মাত্র আট কিংবা নয় বছর।" এইভাবে ঐতিহাসিক নজীর দিয়ে তিনি সবগুলি ব্যাখ্যা করলেন। তারপর হেসে ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, "তোমার ভক্তির অসুবিধে কি? শ্রীকৃষ্ণকে ত তুমি ভক্ত কর ? তাঁর ব্যাপারটা চিন্তা করো ?" সকলে হেসে উঠলো। তখন ডঃ রায় বললেন, "আমরা সামান্য মানুষ মহাপুরুষদের মানলে আমাদের আত্মার উন্নতি হয়। তা তিনি শ্রীকৃষ্ণই হোন কিংবা হযরত মুহম্মদই হোন। ইসলাম এ দিকেও উদার। ইসলামে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর মানার কথা রয়েছে ; কোন ধর্মের কেউই বাদ যাননি।" ...রায়ের বলার ধরনের একটু নমুনা দিলাম মাত্র।

এইভাবে তাঁর প্রত্যেকটি বিষয়ে প্রত্যেকটি বক্তৃতা ইসলামকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করতো। তাই বলছিলাম, যে পরিচিত করবে, তার উপর নির্ভর করবে সে পরিচয় কতটা সম্মান বৃদ্ধি করবে, সেটা।

দৈনিক আজাদ
১৮.৭.৭৬

বিজ্ঞানী মাইকেল এইচ. হার্ট হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি-ওয়াসাল্লামকে মানব জাতির সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব বলে যে স্থির করেছিলেন তা' বৈজ্ঞানিক ও জীবনভিত্তিক দৃষ্টির ভিত্তিতে করেছেন বলে যে বলা হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে গতবার আমি বলেছিলাম ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিচার করে বিশ্বের সর্বাধিক লোকদ্বারা জীবনায়-নের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করানোর কৃতিত্বের জন্যেই তাঁকে তিনি তদ্রূপ মনে করেছেন এবং এই কৃতিত্বের যে সব দিক আমি নিজ জীবনে উপলব্ধি করেছি, এই সম্বন্ধে এবার বলবো।

ইসলামই সর্বপ্রথম সেই ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যেটা একজন মানুষের দৈনন্দিন জীবন সামগ্রিকভাবে যাপনের জন্যে সর্বোৎ-কৃষ্ট। সর্বোৎকৃষ্ট মানে সব চাইতে সহায়ক। জীবনের এমন কোন দিক নাই যার নির্দেশ ইসলামে নাই, এবং প্রতিপালনের জন্যে এমন সব রীতি, বিধি ও নিয়মের অভাব নাই তা যতই সাধারণ মনে হোক না কেন; প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব চাইতে সহজ এবং ফলপ্রসূ হবে। প্রয়োগই হলো ইসলামের আসল কথা; শুধু মুখে আওড়ানোর নীতিতে ইসলাম বিশ্বাস করে না। যে পর্যন্ত না কোন নীতি সদাসর্বদা জীবনে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিফলনযোগ্যই শুধু নয়, দৈনন্দিন পালনযোগ্য বলে না প্রমাণিত হয়, সে পর্যন্ত সেটা সত্যিকার ইসলামী নীতি বলে গৃহিত হয় না।

ধরুন মানুষের সমতার কথা। সব মানুষ এক, বড় ছোট নেই। সাদা-কাল-বাদামীর ভেদাভেদ নাই। এ উক্তি প্রায় সব ধর্মেই রয়েছে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রে এর প্রমাণ রোজকে রোজ ইসলামে যেমন দেখা যায়, তেমন অন্য ধর্মে দেখা যায় না। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত যখন আপনি নামায

পড়তে যান তখন প্রতি ওয়াক্তে এমন তুচ্ছ ব্যক্তির সঙ্গে, আপনি সামান্যতম মানসিক বিতৃষ্ণা কিংবা ঘৃণার ভাব না অনুভব করে, এমন ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ান যাতে তার প্রতি আপনার মনোভাব আপনার অজ্ঞাতে এমন সহানুভূতিপূর্ণ এবং নমনীয় হয়ে দাঁড়ায়, যা যিনি তা করছেন না তিনি কখনও অনুভব করতে পারবেন না।

অবশ্য যারা মুসলমান হয়েও ইসলামী নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ, কিংবা যে সব অমুসলমান ইসলাম বিরোধী তাঁরা হয়তে আমার উপরোক্ত বক্তব্য বলবেন "ভারী কথা বলেছেন! পাশাপাশি দাঁড়ালেই হয়ে গেল? ছোট-বড়র প্রভেদ রইলো না? কিন্তু যে লোকটি পোলাও-কোর্মা খেয়ে ভুঁড়ি মোটা করে অভুক্ত ক্ষুধাকাতর লোকটির পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে, তারা পাশাপাশি এক হয়ে দাঁড়ানোর জন্য ভেদাভেদশূন্য হয়ে গেল?" আমি উত্তরে বলবো, গেলই তো। কারণ ভুক্ত ও অভুক্তর কথা এখানে আমি তুলছি না, তার অন্য নোসখাও ইসলামে রয়েছে এবং সেটা স্বার্থকভাবে ফলপ্রসু করার মতই রয়েছে; আমি তুলছি স্রেফ পাশাপাশি দাঁড়ানোর অধিকারের কথা। ভুক্ত-অভুক্তর কথা কি বলছেন? দক্ষিণ আফ্রিকায় কি সব কাল মানুষ সব সাদা মানুষের চাইতে কম খাচ্ছে? এই কালো মানুষের মধ্যে খাওয়ার শক্তিওয়ালা এমন বহু লোক রয়েছে, যারা সাদা মানুষদের অনেকের কাছে রীতিমত হিংসার পাত্র, কিন্তু পার্শ্বে দাঁড়াতে পারছে কি? পারছে না বলেই তো আজ তা নিয়ে জগত জুড়ে অভিযান চলছে।

এই না-বোঝার কারণ হলো এই যে, আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক রয়েছেন যাদের দুর্ভাগ্যবশত সহজ বুদ্ধির চাইতে জ্ঞান অনেক বেশী। যারা অসুস্থ অবস্থায় অক্সিজেনের অভাবে যখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মনে করেন তখন বাতাসে সহজভাবে অক্সিজেন পাওয়ার কথাটা বললে, হয়তো হতে পারে অনুধাবন করবেন নইলে নয়। হতে পারে বলছি এই জন্যে যে, তারা die hard মত ধরে পথ হারানোর দল, সুতরাং তাদের বিশ্বাস ফেরানো কঠিন।

নইলে এটা খুব সহজে বিশ্বাস করার মত একটা কথা হতো যদি বলা যেত যে আজ যদি সারা দক্ষিণ আফ্রিকার লোক মুসলমান হয়ে যান, তবে বর্ণ-ভেদাভেদের প্রশ্ন সঙ্গেসঙ্গেই মিটে যাবে।

ইসলামের যে-কোন নীতির উপলব্ধি এই মুহূর্তে সঠিকভাবে করার যে অসুবিধা রয়েছে সেটা হলো ইসলাম তেরশো বছর আগে আদি ও অকৃত্রিমভাবে সর্বাধুনিক যে সমাজ ব্যবস্থার কিংবা সমাজের ন্যায়-নীতির ভিত্তি স্থাপন করেছিল সেটার উপর অন্যান্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নানা ধরনের চটকদার ফলাফল। এবং যারা ইসলাম সম্বন্ধে মজ্জাগতভাবে ওয়াকিবহাল নন, তারা ঐ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উদ্ভুত জিনিসকে নূতন কিছু ধরে এমন উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন যে, সেটার ভিত্তি যে আসলেই ইসলাম তা মোটেই উপলব্ধি করতে পারেন না।

বিজ্ঞানী মাইকেল হার্ট যে সূত্র ধরে হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামকে প্রথম ধরেছেন ঠিক সেই সূত্র ধরেই আমার মনে হয়, নিউটনকে দ্বিতীয় ধরেছেন। আমার মনে হয় আমি বলছি এই জন্যে যে, আমি যদি মাইকেল হার্ট হতাম তাহলে আমার সূত্র ঐ ধরনেরই হতো।

মানবজাতির উপর সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিউটনকে তিনি দ্বিতীয় স্থান দান করেছেন নিশ্চয়ই এই জন্যে যে, নিউটনের প্রদত্ত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই বর্তমান বিশ্ব চলছে। এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক জীবন চালু করার মধ্যে যেমন নিউ-টনের চারশো বছর আগে প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তি সহজে আবিষ্কার করা যায়। তেমনি বর্তমান প্রগতিশীল যে কোন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও তেরশো বছর আগেকার ইসলামের নীতি সহজে আবিষ্কার করা যায়। আবিষ্কার করার জ্ঞান, মন ও শক্তি থাকা শুধু প্রয়োজন।

মেয়েদেরকে পুরুষের সঙ্গে উপযুক্ত মর্যাদা সর্বপ্রথম ইসলামই দিয়েছে। তাদেরকে সব রকম অধিকার, (উত্তরাধিকারের অধিকারসহ) ইসলামই দিয়েছে। যে অধিকার মাত্র এই শতাব্দীতে সারা বিশ্বে-মেয়েদেরকে দেয়া হয়েছে, তা ইসলাম তেরশো বছর আগে দিয়েছে। সাম্যবাদ বলুন কিংবা মানুষের সমমর্যাদার কথা, যেটাই বলুন সেটাও ইসলামই সর্ব প্রথম—তাও তেরশো বছর আগে দিয়েছে। মানব জীব-নের এমন কোন হিতকর দিক নেই, যা সর্ব প্রথম ইসলাম কর্তৃক সমৃদ্ধ হয় নেই।

এ কয়েকটা কথা মোটামুটিভাবে যেমন সবাই বলে তেমনি করে বললাম; সুতরাং এটা যে সব ব্যক্তিদের মন অন্যমুখো, তাদের

কাছে ততটা গ্রহণযোগ্য হবে না। না হলে ক্ষতি নেই ; কারণ আগে যেমন বলেছি তেমনি আবার বলবো, আমার জীবনে আমি ইসলামের নীতি-রীতি মানুষের জন্যে কত কল্যাণকর তা' অনুভব যেমন করেছি, তা' যদি বিস্তারিতভাবে দেয়া যায়, তাতে তা কেউ গ্রহণ করুন না করুন, অন্তত সাধারণ বুদ্ধি থাকলে ফেলে দিতে পারবেন না। কারণ আমি ঐ সঠিক ব্যক্তি, যার কথা হুট করে ঠেলে ফেলতে পারা মুশকিল।

যদিও আমি নিজেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়াশীল বলে পরিচয় দিতে একটা খান্দানী আনন্দ অনুভব করি, তবুও মিথ্যা না বললে এটুকু বলতে হয়, যে কাফকা ও ব্রেখ্‌ট যারা আজকাল তা নিয়ে নিজেদেরকে আধুনিক বলে পরিচয় দিচ্ছেন, সে সব আমরা ঘেটেছি তথাকথিত এই আধুনিকদের জন্ম নেয়ার আগেই ; এবং তা যদিও আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছে, কিন্তু লাফালাফি করার মত উৎসাহ দেয়নি। এমনকি আমার বন্ধু কামাখ্যা চক্রবর্তী, যে ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিল এম. এ-তে, এবং যে তখনকার সদ্য ইংরেজীতে অনূদিত এদের গ্রন্থের সঙ্গে আমাদের কয়েকজন আধুনিকমনা ব্যক্তিদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, তারও প্রগতিশীল হওয়ার লক্ষণ তখন দেখা যায়নি। আজকালকার দিনে যেমন, চল্লিশ বছর আগেও তেমনি কিছু লোকের এমনি বাতিক ছিল, যারা নিজেদেরকে প্রগতিশীল বলায় কি বুঝতো আল্লাহ্-মালুম, তবে বাহাদুরী করতো—ঠিক এখন যেমন করে। তা করুক, ইসলাম সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা যা বলি তা প্রগতিশীল মন দিয়েই বলি। তার ফল যা-ই হোক।

দৈনিক আজাদ
৮. ৯. ৭৮

যে কোন ধর্মাবলম্বীর তার ধর্মকে বোঝার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে প্রথমে নির্বিচারে তার ধর্মকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, সেইভাবে আচরণ করে গ্রহণ করা এবং পরে সূক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ক্রমে ক্রমে তার মর্ম উপলব্ধি করা।

সাধারণ মানুষের জন্যে তার ইহলৌকিক ও পারত্রিক হিত সাধনে, কোন ধর্ম যদি সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করতে সক্ষম হয় তা'হলো ইসলাম। এর কারণ এ নয় যে, অন্য ধর্মে মানুষের ইহ-লৌকিক ও পারত্রিক উন্নতি লাভের ব্যাপারে হিতোপদেশের কোন কমতি রয়েছে, এর একমাত্র কারণ ইসলাম জীবন-ধর্মী, এমন একটি মানবিক ধর্ম, যার মধ্যে দৈনন্দিন প্রত্যেকটি সৎকাজকে ইবাদতের শামিল করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক উপাসনাতেই শুধু ইবাদত, অন্যান্য ধর্মের যেমন হয় তেমন শেষ হয় নাই। পথ চলতে, কথাবার্তা বলতেও ইবাদত। এমন কি কারও উপর বিরূপ হলে, কিংবা কারও সঙ্গে চটাচটি হয়ে গেলেও, তার প্রেক্ষিতে যে ব্যবহার, সেটাও ধর্মীয়ভাবে ভাল হলে ইবা-দতের, খারাপ হ'লে গুনাহের শামিল হবে।

ইসলাম মানুষের ধর্ম ; সাধারণ জীবনযাত্রায়, শুধু সৎভাবে নয়, সঠিকভাবেও চলার ধর্ম। উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন কি বলতে চাই। ধরুন খৃস্টধর্মে রয়েছে, যদি কেউ ডান গালে চড় দেয়, তবে বাম গালটি এগিয়ে দিতে হবে। অতীব সৎবাক্য নিঃসন্দেহে। কিন্তু জীবনধর্মী নয়, সুতরাং ইসলাম তা' বলে না। ইসলামী মতে এই চড়টাকে রোধ করতে যতটুকু শক্তির প্রয়োজন শুধু ততটুকুই ব্যবহার করতে হবে তাকে। শক্তি থাকলেও, ইহুদী ধর্মদর্শন অনুসারে পাল্টা চড় দিতে হ'বে না। অর্থাৎ চড় দেয়ার অবকাশ না দেয়া এবং চড় না মারা দুটোই ইবাদত।

এবং ইসলাম ধর্ম দৈনন্দিন জীবনে বাগাড়ম্বর ছাড়া, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজে ও সৎভাবে প্রতিপালন করার আর একটা যে সুবিধা রয়েছে সেটা হলো আমাদের হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন-যাপনের খুঁটিনাটি যে সব আমাদের সামনে রয়েছে, সেটা মেনে চলা। মেনে চললে আপনি দেখবেন, অনায়াসে আপনি এমন কাজ করে যাচ্ছেন, যাতে আপনার অজান্তেই প্রায় আপনার চরিত্র উন্নত হচ্ছে।

ধরুন, আপনি জ্ঞানীলোক, অনেক কিছু জানেন-শোনেন, সুতরাং আপনি সৎপরামর্শ দিতে উপযুক্ত লোক। কিন্তু যে পরামর্শ দিচ্ছেন, আপনার জীবনে তার ব্যতিক্রম ঘটছে। অন্যায়, তবুও ঘটছে। এখন যদি কেউ আপনার নিকট এ সম্বন্ধে পরামর্শের জন্যে আসে, কিংবা আপনি নিজ থেকে কর্তব্যের খাতিরে কোন লোকবিশেষকে কিংবা জনসাধারণকে পরামর্শ দিতে চান, তা'হলে আপনি নিজে যতক্ষণ না নিজেকে সংশোধন করছেন, ততক্ষণ পরামর্শ দেয়া, আপনার উচিত হবে না, এটা আপনি আঁ-হযরতের জীবনধারার সাথে পরিচিত হ'লে করতেই হবে। কারণ তিনি জীবনে যা রপ্ত করেন নি তার পরামর্শও দেননি। নিজে করে অন্যকে পরামর্শ দেয়া এটা জেনে যদি আপনি পরামর্শ দেন তা হ'লে তা ইবাদত হবে। অর্থাৎ আপনি নিজেকে সংশোধন করে তারপর অন্যকে সংশোধনের পরামর্শ দিলেই শুধু সেটা পুণ্যের কাজ হবে। কারণ অন্যের চরিত্রের উন্নয়ন প্রচেষ্টার মধ্যে আপনার চরিত্রও উন্নত হ'বে।

এবার আপনাকে একটি অসম্ভব ব্যাপার ধরতে বলছি। ধরুন কোন ব্যক্তি অত্যন্ত উন্নত একটি বিরাট দেশের প্রেসিডেন্ট—যেদেশে হোয়াইটম্যান নিগ্রোদেরকে খুবই ঘৃণার চোখে দেখে। প্রেসিডেন্ট হোয়াইটম্যান। নিগ্রোদের প্রতি দরদ রয়েছে, আইন-কানুন করছেন, কিন্তু তাতে কাজ হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে যদি তিনি একটি নিগ্রো রমণীকে বিয়ে করেন, তাহ'লে কি দাঁড়ায়; প্রেসিডেন্টের প্রতি লোকের যে টান, ভালবাসা ও আগ্রহ রয়েছে, তার জন্যে ঐ নিগ্রো জাতটাই এ দেশের হোয়াইটম্যানদের চক্ষে উঠে যাবে। হাজার আইনের চেয়ে সেটা বেশী কার্যকরী হবে। এই উপমাটা আমাদেরকে দিয়েছিলেন ডঃ সুধীশ রায়। মুসলিম আইন পড়ানোর সময় যখন একটি হিন্দু ছেলে বহু বিবাহ নিয়ে

হযরত (সাঃ)-এর চরিত্রের উপর কটাক্ষ করেছিল, তখন তিনি এই ধরনের একটি উপমা দিয়ে হযরত (সাঃ) যে একটি জাতিকে ঘৃণা থেকে বাঁচাতে হাবসী বিবাহ করেছিলেন, শুধু তাই বলেন নি; প্রত্যেকটি বিয়ে কতদূর মানবিক দৃষ্টিতে দেখা যেতে পারে তার ইতিহাসগত ব্যাখ্যা দিয়ে সকলকে চমৎকৃতও করেছিলেন। এবং তিনি সম্পূর্ণ ক্লাসকে (আমি ছাড়া সবাই যেখানে হিন্দু ছিল), হযরত (সাঃ)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবনত করেছিলেন।

ডঃ সুধীশ রায়ই মুসলিম আইন পড়ানোর সময় প্রাসঙ্গিক-ভাবে হযরত (সাঃ)-এর আচার-ব্যবহার, চাল-চলন ও অপূর্ব মানবিক দৃষ্টিকোণের কথা এমনভাবে অবতারণা করতেন যে, আমার মনে হতো এ চরিত্রের তুলনা নেই। সেই থেকেই আমি হযরত (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ ধরে বাস্তব জীবনে যতই চলতে লাগলাম, ততই সেটা বেশী আকর্ষণীয় এইভাবে হয়ে উঠতে লাগলো যে, সেটা আমাকে, বুঝি না বুঝি উন্নত তো করলোই, কিন্তু যেটুক বুঝলাম, তাতে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলাম, কোন কোন ক্ষেত্রে নিষ্কলুষও করলো। ধরুন, হিংসা করাটা। আপনারা যারা এটা পড়ছেন, তাদের সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত বলতে পারি যে, আপনারা কাউকে না কাউকে হিংসা করেনই, কমবেশী সবাই তা করেন। কেউ যদি অস্বীকার করেন, তা'হলে যার সামনে তিনি অস্বীকার করলেন তিনি যদি চান ঐ ব্যক্তি মিথ্যে কথা বলছেন, তা হলে তার প্রমাণ সহজেই নিতে পারেন। ঐ ব্যক্তির হিক্কা উঠেছে এমন সময় যদি তার হিংসার পাত্রটির সম্বন্ধে মনগড়া অত্যন্ত একটি শুভ সংবাদ দেন, তা'হলে দেখবেন সেটা তাকে এমন চমকে দিয়েছে যে হিক্কা থেমে গেছে।

যে পর্যন্ত-না একজন অন্যের জন্যে, বিশেষ করে তাঁর শত্রুর জন্যে প্রার্থনা না করেন, সে পর্যন্ত তাঁর নিজের প্রার্থনাও কবুল হয় না। ইসলামের এ আজ্ঞা যেটা হযরত (সাঃ)-এর জীবনধারায় ওতপ্রোত ছিল, আমি প্রায় দশ-বার বছর ধরে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখি হিংসা প্রায় মন থেকে দূর হয়ে গিয়েছে। কারণ যাকে' হিংসা করবো, স্বার্থপরের মতই বলতে পারেন, তার জন্যে দোয়া করতে হচ্ছে, অর্থাৎ আমার নিজের জন্যে দোয়া কবুল হবে না বলেই তার জন্যে দোয়া করছি। সুতরাং যদি ভালো হয়, তবে মনে তেমন দুঃখ হয় না,

কারণ মনে করি আমার দোষী তো ছিলই, আর খারাপ হ'লে তো হিংসার প্রশ্নই উঠে না। মোটের উপর আমি দেখতে পাচ্ছি, হযরত (সাঃ)-এর জীবনাদর্শ ধরে চললে নিজের অজান্তে নিজের রাহের উন্নতি সাধিত হয়। এবং এটা আমি নানাক্ষেত্রে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

আজকের এই কথাগুলো বলছি এইজন্যে যে, মহামান্য প্রিন্স করিম আগা খান হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে যে কথা সীরাত কনফারেন্সে বলেছিলেন সেটা যেন আমার মনের কথা। অনেকে যেমন বলেন ঠিক তেমন করে নয়, আমি যে ধরনে ওটা শুনতে চাই, সেই ধর-নেই বলেছিলেন। কি ধরনের সেটা আমি শুনতে চাই, সেটা যদি জানতে চান তা'হলে তার ঐ ভাষণের খানিকটা দিচ্ছি ঃ

"আমাদের মানবিক চেতনা ও বিবেচনা দিয়ে যে-সব সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজতে চেষ্টা করি তার সবগুলোরই মৌলিক পথ-নির্দেশ আমরা পাক-পয়গম্বরের জীবন থেকে পেতে পারি। তাঁর ন্যায়পরায়ণতা, বিশ্বস্ততা, সাধুতা, ঔদার্য, দারিদ্র, দুর্বল ও অসুস্থদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ, বন্ধুত্বের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, সাফল্যে তাঁর বিনম্রতা, জয়ে তাঁর মহানুভবতা, তাঁর সাধারণ জীবন-যাপন, প্রচলিত পদ্ধতিতে যে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় সেইসব সমস্যার নয়া সমাধান, উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ; এসবই হচ্ছে ভিত্তি যা ইসলামের মৌলিক ধারণাকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। এ সবই আগামী দিনে সত্যিকারের আধুনিক এবং গতিশীল ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে অবশ্যই সাহায্য করবে।"

প্রিন্স করিম আগা খান যে কথাগুলো বলেছেন তার প্রত্যেক শব্দটি পড়ার সময় হযরত (সাঃ)-এর এক-একটি করে সব উদাহরণ আমার এমনভাবে মনে পড়েছে, যাতে মনে হয়েছে বলার সময়ও প্রিন্সের মনে সেইসব উদাহরণ তেমনিভাবে মনে পড়েছিল।

আমি আজকের এই লেখা ওটা পড়ে খুশি হয়ে লেখার জন্যই লিখেছি। এবং এই খুশী হওয়ার একটা বড় কারণ রয়েছে। তৃতীয় আগা খান ছিলেন যেন আমাদের নিজের আগা খান। মানে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে শেরে বাংলা, সুহরাওয়ার্দী, আবদুর রহিম, মুহম্মদ আলী জিন্নাহ, আলীভাইগণ, স্যার মোহাম্মদ শফি প্রমুখ

মনীষিগণের সঙ্গে যে আগা খান ভারতবর্ষে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদেরকে টেনে তোলার চেষ্টা করেছিলেন, মুসলমানদের বাঁচার জন্যে লড়েছিলেন; সেই আগা খানের কথা বলছি, তিনি ছিলেন ভারতের মুসলমান নেতাদের একজন। তখন মুসলমান হিসেবে বাঁচার প্রশ্নই ছিল বড়ো। বাঙালী হিসেবে বাঁচার প্রশ্ন যদিও ছিল, কিন্তু তা ওঠে নাই। তার কারণও ছিল,.তা' হ'লো এই মুসলমান হিসেবেই যদি না বাঁচা যেত, তা'হলে বাঙালী মুসলমান হিসেবে বাঁচার কোন কথাই উঠতো না।

সুতরাং বাঙালী-অবাঙালী নির্বিশেষে যারাই মুসলমানের জন্যে কিছু করেছেন বাঙালী মুসলমান হিসেবেই আমরা তাঁদেরকে আপন মনে করেছি। সেইভাবে আগা খান আমাদের আপন ছিলেন, কারণ আমাদের রাজনীতির সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁর বুদ্ধির প্রতি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল। তিনি যখন বর্তমান প্রিন্স করিম আগা খানকে ইমামতি দেন তখন ইনি যুবক ছিলেন মাত্র। তাঁর বাবা ও চাচাকে বাদ দিয়ে তাঁকে ইমামতি দেয়ায় আমাদের মহামান্য আগা খান যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন তা জানতাম। হযরত (সাঃ) সম্বন্ধে বর্তমান আগা খানের বক্তব্য পড়ে আজ মনে করছি ঠিকই জানতাম।

দৈনিক আজাদ
২০. ১১. ৭৭

হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যে বৈশিষ্ট্য তাঁকে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে স্বতন্ত্র করেছে, সেটা সাধারণ মানুষের জন্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করার খুব সহজ ও সরল কার্যক্রম। মানুষ মানুষের হিতের জন্যে সর্বদা সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করবে এবং যে-সত্য সে এই চেষ্টায় আবিষ্কার করবে, সেটা প্রচারের অদম্য চেষ্টা করবে, নিজের মধ্যে সেটাকে নিবদ্ধ রাখবে না, এই হলো হযরত (সাঃ)-এর মধ্যে সত্যানুভূতিপ্রসূত কার্যক্রমের বৈশিষ্ট্য।

এবং এটাই পৃথিবীতে যাঁরা করেছেন তাঁরা মহাপুরুষ হিসেবেই শুধু নয়, সাধারণ মানুষ হিসেবেও বড় হয়েছেন। যিনি করতে পারেন নি, পরবর্তীকালে তাঁরই লব্ধ সত্যের অনুসারী কেউ সেটাকে জীবনায়নের জন্যে সার্থকভাবে প্রচার করে তাঁর সেই গুরুর সত্য উপলব্ধিকে সার্থক করেছেন। এইভাবে সেন্ট পল যীশুখৃস্টের সত্যকে প্রচলিত করেছিলেন বলে মাইকেল হার্ট তাঁকে যেমন উচ্চস্থান দিয়েছেন তেমনি যীশুখৃস্টকে, তিনি খৃস্টান হওয়া সত্ত্বেও তৃতীয় স্থান দিয়েছেন। কার্লমার্কস্ লব্ধ সত্যকে আশানুরূপ জীবনায়নের ব্যবস্থা করতে পারেন নি, পেরেছিলেন লেনিন। সুতরাং লেনিন মাইকেল হার্টের তালিকায় একশোজনের মধ্যে নিজেরই স্থান করে নিতে যে সক্ষম হয়েছেন তাই নয়; কার্লমার্কস্‌কেও তাঁর যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে সক্ষম হয়েছেন। যদি লেনিন মার্কস্‌বাদকে কাজে না লাগাতেন তবে মার্কস্‌ও হার্টের তালিকায় কোন স্থান পেতেন না, যেমন মহাত্মা গান্ধী পান নি; কারণ তাঁর অহিংসা নীতিকে এ পর্যন্ত কেউ মানুষের জীবনায়নে কাজে লাগাতে পারেন নি। সক্রেটিস স্থান পাননি, কারণ তাঁকে তুলে ধরেছিলেন তার শিষ্যবৃন্দ। অর্থাৎ মাইকেল হার্টের তালিকা করার প্রণালী লক্ষ্য করলে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাবে; সেটা হলো

যে-কোন মহাপুরুষ তাঁর চিন্তাধারা যতই চমকপ্রদ ও উচ্চাঙ্গের হোক না কেন, যে পর্যন্ত না তাঁর সেই চিন্তাধারা মানুষের জীবন-যাপনের কাজে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত হয়ে তাকে চালিত করতে সক্ষম না হয়, সে পর্যন্ত তিনি মানুষ হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের দাবি করতে পারেন না।

মুসলমান হিসেবে, মাইকেল হার্টের এই চিন্তাধারা আমাকে চমৎকৃত করেছে। কারণ হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে কোন ধর্মের বা মতবাদের যে কোন ব্যক্তি যদি ঐ দৃষ্টি দিয়ে দেখেন তা হলে মাইকেল হার্টের বিচারটা অনায়াসে মেনে নিতে পারেন ; এবং যতক্ষণ না তা মেনে নিতে পারছেন ততক্ষণ বোঝা যাবে যে, তিনি সঠিক দৃষ্টিতে দেখতে সক্ষম হচ্ছেন না। এমনকি তিনি যদি মুসলমানও হন তা হলেও একথা তাঁর সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে। কারণ হযরত (সাঃ)-কে মুসলমান না হয়েও সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করার যে কারণ রয়েছে সে কারণ যদি কেউ আবিষ্কার করতে না পারেন তা'হলে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলার মধ্যে ধর্মীয় উদ্দীপনাই বেশী কার্যকরী হবে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতেও যে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ তা তাঁর সম্যক উপলব্ধি হবে না, এবং এই দৃষ্টি লাভ করার জন্যে যে তীক্ষ্ণ ব্যতিক্রমধর্মী বুদ্ধি, বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও জ্ঞানের প্রয়োজন ; তা' না থাকলে হযরত (সাঃ)-এর মহত্ত্বের দুয়ার ঐ পথে তাঁর কাছে খুলবে না। আমি এর আগে বলেছি, যে বায়ু আমাদের জীবন ধারণের সাহায্য করে, সেটার মধ্যে আমরা যে সহজভাবে বেঁচে থাকি এটা বোঝা খুবই সোজা, কিন্তু এর মধ্যে যে উপাদানগুলো আমাদের বাঁচায় সেটা বুঝে এই বেঁচে থাকার কারণ বোঝাটা অন্য জিনিস। কোন সত্যিকার মুসলমানের ইসলামের পরিবেশে জীবন ধারণ করে বাঁচা এবং ইসলামের প্রতিটি বিষয়কে বিচার করে সেই বাঁচার অর্থ গ্রহণ করে বাঁচা এই দুয়ের মধ্যে ঠিক অমনি তফাত। এবং সেই ধরনের চিন্তা করার দিনই আজ এসেছে। এবং এই চিন্তা করার একটা ইঙ্গিত মাত্র পাওয়া গেছে মাইকেল হার্টের 'দ্য হাণ্ড্রেড' বইটায়।

ধরুন আপনি একজন কম্যুনিস্ট ; সাতশো বছর পরের কথা চিন্তা করছেন। আপনি কি হল্‌ফ করে বলতে পারেন যে, কার্লমার্কস্ কিংবা লেনিনের তখনকার দিনে কোন প্রভাব থাকবে? ঐতিহাসিক

অস্তিত্ব থাকবে মনে করতে পারেন? কারণ তাঁরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি; এবং তাঁদেরসংক্রান্ত ঘটনাগুলো ঐতিহাসিক ঘটনা, কিন্তু তাঁদের প্রভাব থাকবে মনে করলে আপনার বুদ্ধির অভাব বলে ধরে নেবো। কারণ তাঁদের ব্যবস্থা বর্তমানে একপ্রকার সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের কাঠামোর উপর ভিত্তিমান, যেটা যুগে যুগে পাল্‌টাবে, কারণ পাল্‌-টাতে বাধ্য। বর্তমানে তাঁদের মধ্যে সূক্ষ্ম থেকে স্পষ্ট প্রভেদ যা দেখা যাচ্ছে তাতে সাতশো বছর তো দূরের কথা, পঞ্চাশ বছরে যে সেটা কি হবে তা চিন্তা করাই মুশ্‌কিল।

এর কারণ হলো সমাজ ধরে এ ব্যবস্থা, মানুষ ধরে এ ব্যবস্থা হয় নাই। সমাজ কি হবে, রাষ্ট্র কি হবে সেটা নির্ভর করবে তখনকার মানুষের মতামতের উপর। কিন্তু মানুষকে ধরে যদি কোন ব্যবস্থা হয়, যেটা সব মানুষের মধ্যে সমতা আনায় সহায়ক হয় তা হলে সেটা চিরন্তন হওয়ার কথা; এবং সেটা যদি ধর্মভিত্তিক হয় তা হলে আরও ভালো, কারণ ধর্ম সাময়িকভাবে কোনো কোনো সমাজে অনুসৃত না হলেও ধর্মকে ভবিষ্যতে একেবারে ফেলে দেয়া যাবে না। কারণ মানুষের নানারকম ভয় চিরকাল থাকবেই এবং এই ভয়ের সঙ্গে পরকালের ভয়ও যে থাকবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তা ছাড়া ধর্ম-ব্যবস্থায় যদি এমন মানবিক অধিকার দেয়া হয় যাতে করে সেটা মানুষের অস্তিত্বের শামিল হয়ে দাঁড়ায় তা হলে তো কথাই নাই।

ইসলাম তেরশো বছর টিকেছে, শুধু তাই নয়; মুসলমানের সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। যারা দেশে যে সমাজব্যবস্থাই থাকুক না কেন, মুসলমান হিসেবে মোটামুটি টিকে আছেন। কেন? কারণ ইসলামে যে মানবিক ব্যবস্থা রয়েছে তা প্রায় চিরন্তন। প্রায় চিরন্তন বললাম এই জন্যে যে, সত্যিকারভাবে যাঁরা ইসলাম অনুসরণ করেন তাঁরা যুগে যুগে একই থাকবেন। একথা আমি নিজে যেভাবে ইসলাম অনুসরণ করছি সেইভাবে চিন্তা করেই বললাম।

ইসলামের মানবিক দিকের কথা এবার বলি। আজ একজন মানুষ যেমনি ভালবাসে, আগামীতে চিরকালই তেমনি ভালবাসবেই। অর্থাৎ একজন লোক তার বাবা-মা, পুত্র-কন্যা এবং স্বামী হলে স্ত্রীকে আর স্ত্রী হলে স্বামীকে ভালবাসবেই এবং যে আইন এই ব্যবস্থা

অবলম্বন করে এসেছে সেটা চিরস্থায়ী হবেই। যদিও কয়েক যুগে সক্রিয়ভাবে তার ব্যত্যয় ঘটানো যেতে পারে। কিন্তু চিরকালের জন্যে সেটা করা শক্ত হতে বাধ্য। এই মানবিক দিকের কথা সর্বপ্রথম আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে যেন দেখালেন ডাঃ সুধীশ রায়, যাঁর কথা পূর্বে বলেছি এবং এবার আবার বলছি, কারণ বলাটা দরকার।

তিনি আমাদেরকে মুসলিম আইন পড়াতেন। প্রথম দিনেই হাতে একখানা খড়ি নিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং প্রত্যেকটি ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে মারা গেলে তার সম্পত্তি কে কে পাবেন—সে ইচ্ছে করে। জিজ্ঞেস করে যেতে লাগলেন বাপ কি সব পাবে? ছেলে কি সব পাবে? মেয়েরা কি বাদ পড়বে? স্ত্রী কি কিছু পাওয়ার উপযুক্ত? স্বামীকে কি পরিমাণ দেয়া যায়? ইত্যাদি প্রশ্ন করে যেতে লাগলেন এবং সম্পূর্ণ ক্লাসের চল্লিশটি ছেলে, আমি ছাড়া সবই হিন্দু একমত হয়ে যাকে যে অংশ দেয়া স্থির করলো সেটা তিনি বোর্ডে লিখলেন। লিখে বললেন, মুসলিম আইনেও হুবহু এই ব্যবস্থাই রয়েছে।

এই ব্যবস্থায় শুধু আত্মীয়পরায়ণতা ছিল না, সমাজতন্ত্রের সূত্রপাত ছিল, সাম্যবাদের সূত্রপাত ছিল, নারীর অধিকারের সূত্রপাত ছিল।

এবং মুসলিম আইনের হুবহু এই ব্যবস্থা বহু হাজার বছর পরে ইদানিং হিন্দু আইনে গৃহীত হয়েছে।

সুতরাং বড়াই করতে জানলে, মুসলমান হিসেবেই সব চাইতে বেশী বড়াই করা যায়; তার একটিমাত্র উপমা আজ দিলাম।

দৈনিক আজাদ
১০-৯-৭৮

জীবনে যে কোন জিনিস যদি সূক্ষ্মভাবে চিন্তা দ্বারা এমন অর্থ আবিষ্কার করার মওকা দেয়, যা আপাতদৃষ্টিতে লক্ষিত হয় না, তা হলে সেটা ভালোই হোক কিংবা মন্দই হোক, অপ্রত্যাশিতভাবে চমকিত করে। এবং সেটা যদি ভালোর দিকে হয় তা'হলে সেটা অপ্রত্যাশিতভাবে আনন্দও দেয়; এবং যতটা ভালোর দিকে হয়, ততটাই আনন্দিত করে।

আবার এই আনন্দ থেকে আমরা অপত্যাশিতভাবে শান্তিও পাই। যদি এই সূক্ষ্ম চিন্তা করার ব্যাপারটা ধর্ম-সংক্রান্ত হয়।

ধর্ম-সংক্রান্ত সূক্ষ্ম চিন্তার কথা বলতে গেলে, অবশ্য এ বলতে হয়, সে প্রত্যেক ধর্মেই এমন কতগুলি ব্যাপার থাকে যা অন্ধ বিশ্বাসের অন্তর্গত, যা সম্পূর্ণভাবে এমন আধ্যাত্মিক স্তরের—যে তার উপর কোন তর্ক চলে না; তা বিশ্বাসে মেলে, তর্কে দূরে চলে যায়। এবং শুধু বিশ্বাস করেই তাতে তৃপ্তি ও শান্তি আসে, তর্কে সেটা লভ্য নয়। শুধু বিশ্বাস করেই শান্তি আসে তার কারণ এই যে, এই বিশ্বাসই প্রত্যেকের আত্মা-কে এমন একটা স্বর্গীয় উন্নত স্তরে নিয়ে যায়, যেখানে আত্মার সকল উপলব্ধি অন্তর্জ্ঞানীয় হয়ে ওঠে এবং সে পার্থিব কি অপার্থিব তা বিচারের বাইরে চলে গিয়ে অনুভূতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এসব জিনিসের অর্থ সূক্ষ্ম চিন্তা দ্বারা আবিষ্কারের প্রশ্ন ওঠে না, কারণ সেসব প্রশ্নাতীত। যেমন মি'রাজ। এই ধরনের চেতনার অন্তর্জ্ঞানীয় উপলব্ধির সর্বোচ্চ স্তরের ঘটনা প্রত্যেক ধর্মেই রয়েছে এবং প্রত্যেক ধর্মের অনুসারিগণ তা' কোন প্রকার প্রশ্ন না করে প্রশ্নাতীত হিসেবেই গ্রহণ করছেন।

কিন্তু পার্থিব দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ঘটনার প্রতি ধর্মীয় অনুশাসন অন্য জিনিস। সেটার কথাই বলছিলাম। অনেক সময়

এই অনুশাসন আমাদের ধারণায় প্রতিকূল বলে মনে হয়, কিন্তু সেটাকে সূক্ষ্ম চিন্তার দ্বারা যদি অনুকূল বলে মনের কাছে প্রমাণিত করা যায়; তা'হলে সেটা যে মনকে শুধু খুশী করে তাই নয়; অনির্বচনীয় শান্তিও দেয়।

গত বছর ঈদে কুরবানীর জন্যে মাসলা-মাসায়েল দেখতে গিয়ে একটা মস্‌লা দেখলাম এই রয়েছে ঃ

> ধনী ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে কোন পশু খরিদ করিলে সেই পশু হারাইয়া গেলে তাহার অন্য পশু খরিদ করিয়া কুরবানী করা ওয়াজিব হইবে। তাহার পরে হারান পশু পাওয়া গেলে পুনরায় ঐ পশু কুরবানী করা দরকার হইবে না।
>
> কোন গরীব ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে পশু খরিদ করিলে সেই পশু হারাইয়া গেলে অন্য পশু খরিদ করিয়া কুরবানী করিবে। কিন্তু কুরবানীর পরে হারান পশু পাওয়া গেলে উহাও আবার কুরবানী করিতে হইবে।
>
> —দুররুল মুখ্‌তার

গরীব ব্যক্তি অর্থাৎ যিনি সাহেবে নিসাব নন, অর্থাৎ যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়।

এই মসলাটা আমার মনে প্রথমে বেমানান লাগে, তারপর আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, যত কিছু আমার কাছে প্রথমে বেমানান লেগেছে তা' আমি চিন্তা করে করে মনের কাছে মানানসই করতে পেরেছি।

আমি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম মুসলিম আইন পড়ানো শুরু করি, তখন থেকেই আমি বুঝতে পারি প্রতিটি বেমানান আইনের ধারা শুধু যে মানানসই তাই নয়, মানবিক গুণেও গুণান্বিত। এ বের করার জন্যে আমার অনেক চিন্তা করতে হতো। কারণ ছেলেরা প্রশ্ন করতো তার উপরে।

"পিতা জীবিত অবস্থায়, এবং তার অন্য ছেলে থাকা অবস্থায়, যদি তার কোন ছেলে মারা যায় তা'হলে ঐ ছেলের মৃত্যু অন্তে ঐ ছেলের ছেলেরা তাদের দাদার কোন সম্পত্তি পাবে না।" এই বিষয়টা আমি যখন একবার ক্লাসে পড়াচ্ছিলাম তখন একটি ছেলে দাঁড়িয়ে

আমাকে বললো, "স্যার, এ আইনটি ন্যায়সঙ্গত নয়।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি করে বললে?" সে বললো, "স্যার, আমি ভুক্তভোগী!" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কি রকম?" সে বললো, "আমার দাদা মারা গেছেন, আমার তিন চাচা তাঁর সম্পত্তি পেয়েছেন।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কিছুই পাওনি?" সে বললো, "উত্তরাধিকারসূত্রে কিছুই পাইনি, আমার দাদা হিবা করে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছিলেন।" আমি বললাম, "তা' হলে ন্যায়সঙ্গত নয় বলছো কেন? তুমি তো তোমার চাচাদের চেয়ে বেশী পেয়েছো। তোমার বাবা বেঁচে থাকলে তোমাকে হিবা করে কোন সম্পত্তি দেয়ার প্রশ্নই হয়তো উঠতো না। কারণ হিবা করে দিলে তার থেকে স্বামীত্ব পুরোপুরি ত্যাগ করতে হয়।"

সত্যিকারভাবে দেখতে গেলে দাদা তার বাপের মরাটা ঠেকাতে পারেন না, কিন্তু তার পৌত্রকে এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সম্পত্তি উইল করে দিয়ে যেতে পারেন। যেটা তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের সঙ্গে একজোটে সে পেতে পারে। অর্থাৎ দাদার দেয়ার ইচ্ছে থাকা চাই; এবং আমার জানা মতে প্রত্যেক দাদাই প্রায় এই ধরনের ব্যবস্থা আগেই করে যান।

আল্লাহ্ উত্তরাধিকার আইন স্নেহ ও ভালবাসাভিত্তিক করেছেন। অর্থাৎ যে লোক মারা যাবেন তার ভালবাসার ভিত্তিতে তিনি যার যা পাওনা মনে করবেন আল্লাহ্ প্রায় তাই সেই রকম দিয়েছেন। সুতরাং যে পৌত্র উত্তরাধিকার আইনে বঞ্চিত হবে, তাকে দাদা উইল-যোগে অনায়াসে দিতে পারেন। তার পিতা বর্তমান থাকলে তা' পার-তেন না। সুতরাং তার মৃত্যুর দ্বারা আল্লাহ্ যেটা দিলেন না, সেটা তার দাদাকে দিয়ে দেয়াতে চান, এইমাত্র; কোন অন্যায় ঘটার অবকাশ যদি থাকে তবে তা হবে দাদার কর্তব্যহীনতার জন্যে।

মোটের উপর এর দ্বারা গোড়াতে যেটা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা বলা হ'ল। অর্থাৎ বেমানান যে মনে হয়, সেটা হয় আমাদের বোঝার অভাবে।

এবার যার জন্যে এই কথাগুলো লিখছি সেটার কথা বলা যাক।

যার উপর কুরবানী ওয়াজিব হয় নাই সেই ব্যক্তি যদি কুর-বানী দেয়ার জন্যে পশু কেনে, এবং সেটা হারিয়ে যায়, তা'হলে অন্য পশু কিনে সেটা কুরবানী দিতে হবে এবং ঐ পশু পেলে ওটাও কুরবানী দিতে হবে। অথচ বড়লোকের বেলায় তা নয়। কেন? গত বছর বহু চিন্তা করেছিলাম, শেষে মনে হয়েছিল যার কুরবানী ওয়াজিব নয়, সে যদি সে জন্যে কোন পশু কেনে তা হলে, ঐ পশু-টাই তার পক্ষে কুরবানী দেয়া যেমন ওয়াজিব হয়ে যায় তেমনি ঐ পশু হারালেও অন্য পশু কুরবানী তার উপর ওয়াজিব থেকে যায়। সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই পশুটি তাকে কুরবানী করতে হয়। ইদানীং কোন একটা বইতে দেখলাম, ঐ ধরনের কথাই লিখেছে।

মোটের উপর এটা মনে হয় ঠিক এই জন্যে যে, ইসলাম ধর্ম কাউকে কষ্টে ফেলে না। যে গরীব, আল্লাহ্ চান না সে বাহাদুরী দেখাবার জন্যে কিছু করুক; যদি করে তা'হলে তার খেসারতও তাকে বহন করতে হবে।

এর সব চাইতে উৎকৃষ্ট নজীর কুরআনে রয়েছে:

يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى -

অর্থ: আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে সহজ চান; তোমাদের জন্যে কঠোরতা চান না।

এমন কি যদি কোন কঠিন দুটি সমস্যা দেখা দেয়, তা হলে উসূলে ফিকাহ্ বলে, "দুইটি সমস্যা যদি একই সময়ে দেখা দেয়, তা হলে অপেক্ষাকৃত সহজটাকেই গ্রহণ করা উচিত।"

ধর্মে যেটা কর্তব্য নয়, লোক দেখানোর জন্যে অতিরিক্তভাবে যদি কেউ তা করতে থাকে তাহলে নজীর হিসেবে তা এমন জেঁকে বসতে পারে যে, পরবর্তীকালে তার সমস্ত রেশ লোকদের উপর করণীয় হিসেবে অত্যাচারের মত হয়ে উঠতে পারে। উপরের আয়াতটি সেই সব ঠেকানোর জন্যেই। তাই বলছিলাম ইসলামে এমন কোন কিছু নেই যা বুদ্ধি দিয়ে নাগাল পাওয়া যায় না।

দৈনিক আজাদ
১৯. ১. ৭৮

বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলী মানব সমাজকে ধর্মের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলেন, "ধর্মের আইন অনুসরণে ব্যর্থতার জন্যই সর্বপ্রকার সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি হইয়াছে।" উত্তর ক্যারোলিনার ডুরহামে তাঁহার সম্মানে প্রদত্ত এক ভোজসভায় ভাষণ দানকালে মোহাম্মদ আলী বলেন, রাজনীতি-বিদদের প্রণীত আইনের পূর্বে মানুষের উচিত আল্লাহর আইন মানিয়া চলা। তিনি বলেন, আমরা ধর্মের কথা বলি অথচ বাস্তব জীবনে তাহা মানিয়া চলি না।

মোহাম্মদ আলী একটি স্বাস্থ্য ও শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বর্তমানে ডুরহামে অবস্থান করিতেছেন।

'ধর্মীয়নীতি অনুসরণে ব্যর্থতা সব অবক্ষয়ের জন্যে দায়ী'— এই শিরোনামে উপরোক্ত সংবাদটি আজাদ এবং টাইম্‌স্‌-এ ২৯শে ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। অন্য কোন পত্রিকায় ঐ দিন এই সংবাদটি দেখলাম না।

এবার এই সংবাদটির উপরই আজকের আলোচনা হ'বে।

ধরুন এই মোহাম্মদ আলী যদি মুষ্টিযুদ্ধের উপর কিছু বলতেন, তা' হ'লে সেটা সকলের কাছে সংবাদ হতো। তবুও তিনি একটি শারীরিক শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন সেখানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সম্মানে প্রদত্ত ভোজসভায় যখন এ বক্তৃতাটা দিয়েছিলেন, তখন এটার সংবাদ হ'তে কোন বাধা ছিল না; কিন্তু এটা হয়তো তেমন সংবাদ বলে ধরা হয় নি; কারণ তিনি বলেছেন, ধর্মীয় নীতি অনুসরণে ব্যর্থতাই সব অবক্ষয়ের জন্যে দায়ী; অর্থাৎ তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে বলাটা সংবাদ হওয়ার খুব একটা বড়ো দাবি রাখে না।

ভাগ্যিস তিনি মুসলমান, নইলে তাঁর ধর্মীয় কথাটা সংবাদ কেন হ'বে সেটা জোর করে তুলে ধরতে আমার অসুবিধে হতো।

কারণ যে কোন সাধারণ বুদ্ধির মানুষ, মুসলমান হ'লেই তিনি ধর্ম সম্বন্ধে বোঝার এবং বলার অধিকারী হ'তে পারেন। কেননা ইসলাম এমন সহজ-সরল ধর্ম যেটাকে মানুষ হিসেবে বুঝতে এবং দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধি ও ব্যবহার করে তার দ্বারা কাজ চালাতে পীর-মুর্শিদ কি ধর্মযাজকের প্রয়োজন হয় না। কারণ, এটা দৈনন্দিন জীবনের ধর্ম। কোন একটি মোহাম্মদী পঞ্জিকায় প্রথম দিকে ইসলামের কালেমা, নামায রোযা, হজ্ব, যাকাত এবং হারাম, হালাল ইত্যাকার যে-সব কথা বলা হয় মোটামুটি সেসব উপলব্ধি করে, এবং দৈনন্দিন প্রত্যেকটি কাজ ইবাদত মনে করে যদি কেউ কাজ করে তৃপ্তি পায় তা' হ'লেই সে ইসলামকে উপলব্ধি করেছে বলা যাবে। সুতরাং তার উপলব্ধি জ্ঞান সম্বন্ধে সে বলার অধিকারী। ইসলাম বুঝতে এবং জীবনে কার্যকরী করতে যদি কেউ মনে করেন বহু তত্ত্বজ্ঞান দরকার তা' হ'লে তিনি ইসলামকে সাধারণ মানুষ থেকে দূরে নিয়ে যাবেন।

আপনারা যারা আমার ইসলাম সম্বন্ধে লেখাগুলো পড়েন—তারা যদি তা' কোনক্রমেও পছন্দ করে থাকেন, তা' হ'লে বলবো আমি ইসলাম বুঝতে বেশ পড়াশুনা যদিও করেছি, কিন্তু আসলে বুঝার সময় বুঝেছি যে অত পড়াশুনা না করলেও আমি আমার সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু বুঝতে পারতাম সেটাই ইসলাম হতো। আল্লাহ্‌র শোকর যে, তিনি আমাকে দিয়ে কিছুটা পড়াশুনা করিয়েছিলেন শুধু এইটুকু বুঝার জন্যে যে, ইসলাম বুঝার জন্যে ইসলামের সাধারণ ধর্মনীতিগুলি ও ধর্মবুদ্ধিই যথেষ্ট; এই জন্যেই এটাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বা দ্বীন বলা হয়।

এবং এই ইসলাম বুঝার জন্যে আসল যে কথা সেটাই চ্যাম্পিয়ন মোহাম্মদ আলী এইভাবে বলেছেন, "রাজনীতিবিদদের প্রণীত আইনের পূর্বে মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র আইন মানিয়া চলা। আমরা ধর্মের কথা বলি অথচ বাস্তব জীবনে তাহা মানিয়া চলি না।"

এর অর্থ আমি যেটা বুঝি সেটা হলো, রাজনীতিবিদদের আইন যে আল্লাহ্‌র আইনের ব্যতিক্রম হয়, তা নয়; আল্লাহ্‌র আইন মেনে চললে সেটা আরো গভীরভাবে, আরো ব্যাপকভাবে মানা হয়। যে কোন

রাজনীতিক আইন পর্যালোচনা করলে তা' বোঝা সহজ তবে আমি মাত্র একটি উপমা দেব। ধরুন, ফ্যাক্টরীতে একজন শ্রমিকের কিংবা কোন বড় অফিসে একজন পরিচালকের আট ঘন্টা করে কাজ করার কথা। এই আট ঘন্টা কাজ তিনি মন দিয়ে করতে পারেন, অনিচ্ছায় করতে পারেন, বাধ্য হয়ে করতে পারেন; যেভাবেই করুন তাতে তাঁর আইনানুসারেই কাজ করা হ'বে। কিন্তু তিনি যদি আল্লাহ্‌র নির্দেশ এতে মেনে নিয়ে তাঁর মনের অবস্থা যাই থাকুক সেটাকে কার্যকরী হ'তে না দিয়ে, একান্তভাবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে কাজ করে যান তা হ'লে সেটাই ঠিকমত কাজ করা হ'বে। এবং এই ধরনের কাজেই শুধু অবক্ষয় রোধ করা যাবে, অন্যথায় নয়।

মুসলমান হওয়ার প্রধান অর্থই হলো, সুষ্ঠুভাবে কর্তব্যকর্ম করাকে ইবাদতের অঙ্গ বলে ধরে নেয়া। এবং মুখে যতই ধর্মকথা বলি না কেন; ধর্মীয় শাস্ত্রে যতই পণ্ডিত হই না কেন, যে পর্যন্ত না আমার কাজ সমগ্র মানুষের অবস্থাকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে না যাবে, সে পর্যন্ত আমার কর্তব্য পালনেই যে ব্যাঘাত ঘটবে তাই নয়, ধর্ম পালনেও ঘটবে। অবশ্য প্রত্যেকটি ধর্মেরই তাই নির্দেশ; কিন্তু ইস-লামে দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোত ধরা হয় বলে, যারা সত্যিকার মুসলমান তাদের কাছে সেটা বেশী করে অনুভূত হয়। সেই জন্যেই মুষ্টিযোদ্ধা হয়েও মোহাম্মদ আলী ধর্ম সম্বন্ধে অমন পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করে বলতে পেরেছেন।

যে-কোন ধর্মের ব্যাপারেই ধরুন যারা তার ধার ধারে না, তারাও যেমন ভ্রান্ত, যারা 'কাট' তারাও তেমনি। মুসলমান হিসেবে, অবশ্য আপনি সহজে বুঝবেন যে, যাঁরা ধর্মের ধার ধারেন না, তাঁরাও যেমন ভ্রান্তি আনেন, যাঁরা এর মধ্যে সত্যিকার উদারতা উপলব্ধি না করে গোঁড়ামি করেন তাঁরাও তেমনি ভুল ধারণার সূত্রপাত করেন; কিন্তু এটা অন্যধর্মেই শুধু নয়, মতবাদেও প্রযোজ্য। ওদিন আমার পরিচিত একজন লোক বলছিলেন, "আজ আমার এক বন্ধু কাট-সোশ্যালিস্ট-এর সঙ্গে এক বাহাস হয়ে গেল।" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কাট-সোশ্যালিস্ট আবার কি?" তিনি বললেন, "ওরা ঐ কাট-মোল্লার মতই। আসল জিনিস না-বুঝেই অন্ধের মত গদগদ ভাব। সোশ্যা-লিজম খুবই ভালো, কিন্তু সেটা সার্থক হওয়ার যে ছক, তার জন্যে

প্রাণপণে যে খাটতে হয় তা' যে মানে না ; ফাইভ ফিফটি-ফাইভ সিগারেট টানতে টানতে আরাম কেদারায় বসে যতই আপ্লুত হোন না-কেন তিনি কাট-সোশ্যালিস্ট ছাড়া কিছু নন।" তিনি বললেন, "এরা মনে করেন সোশ্যালিজম যেন কখনো ইসলামের ধাতে ছিল না। বলুন এরা কাট-সোশ্যালিস্ট ছাড়া আর কি ?" আমি বললাম, "ইসলামে যেটা রয়েছে সেটাও সোশ্যালিজম, সেটাও ঠিক অমনি করে সব মানুষের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারতো যদি প্রতি মুসলমান খাঁটি মুসলমান হয়ে সেটা চালাতো। খাঁটি সোশ্যালিস্ট না হয়ে সোশ্যালিজম চালানোর কিছু নমুনা আমরা পেয়েছি, খাঁটি মুসলমান হয়ে ইসলামী সোশ্যালিজম চালানোর প্রচেষ্টা এখনো দেখতে বাকী।"

মোটের উপর কথা, খাঁটি হতে হ'বে, তা' সে যে-কোন চিন্তাধারা অবলম্বন করেই আমাদেরকে চলতে হোক না কেন ? 'ইজম'-'আইট' নাই হোক ; সাদা-মাটা ধরনের নিজেদেরকে উন্নতি করার যে-কোন পদ্ধতিই গ্রহণ করা হোক না কেন, খাঁটি মানুষ হিসেবে আমাদেরকে খেটে খেতে হ'বে তা কার্যকরী করার জন্যে , তা সেটা স্বনির্ভর কোন কার্যক্রমই হোক কিংবা পরিবার পরিকল্পনাই হোক। এবং খাঁটি অর্থাৎ গোঁড়ামি ছাড়া। এবং এটাই হলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় চলা। অন্যকে নকল করার মধ্যে যতই উন্নত হওয়ার চেষ্টা পাই না কেন, সেটা তো আসলে নকলই ; সুতরাং সেটা পরিত্যাগ করে ; নিজেদের জন্যে নিজেদের চিন্তাধারায় যেটা প্রশস্ত সেটাই চেষ্টা করাকে ধরা যেতে পারে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় চেষ্টা করা। এবং এটা ধর্ম নির্বিশেষে ঠিক। সেই জন্যেই মোহাম্মদ আলী কোন বিশেষ ধর্মের উল্লেখ করে বলেননি, বলেছেন, "রাজনীতিবিদদের প্রণীত আইনের পূর্বে মানুষের উচিত আল্লাহ্‌র আইন মানিয়া চলা।" অর্থাৎ খাঁটি ও শুদ্ধ মনে যদি মানুষের উন্নতি করে যেতে পারেন তবে সেটাই আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে চলা হবে এবং সে আইনানুযায়ী যেটাই করেন তাতেই অবক্ষয় বন্ধ হবে, নইলে শুধু আইন আপনাকে তা থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

এটাই হলো আসল কথা এবং ইসলামের মূলমন্ত্রও।

দৈনিক আজাদ
১. ১. ৭৮

গত রোরবারে একটি বিয়েতে দাওয়াত খেতে গিয়ে বিয়ে সম্বন্ধে কিছু কথা মনে পড়লো যেটা অন্যতরো দৃষ্টিতে দেখার মত।

প্রথম বিয়ের কথাই ধরুন। সবাই বলে মুসলিম ধর্মের বিয়ে একটা চুক্তি। হিন্দু ও খৃস্টান ধর্মের বিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং তা' ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলা হয় এইজন্যে যে, মুসলিম বিয়ের মত ইজাব-কবুল দ্বারা, অর্থাৎ চুক্তির ভাষায় সে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় না; অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হয়। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে সত্য মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে ইসলামের সব কিছুর মত বিবাহও জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ।

ইসলামের প্রতিটি কাজ, মায় আমার এই 'দৃষ্টি অন্যতরো' লেখাটা দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলেও আমি মনে করি। কারণ এটা ইবাদতের শামিল। আমি মনে করি এই জন্য বললাম যে, যদিও প্রত্যেক ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজ তার ইবাদত বলে ধরা উচিত, তা' তারা অনেকেই করেন না। আমি কিন্তু করি। যেটা কাজ বলে করি, সেটা বেশ মন দিয়ে এমন খেটেখুটে করি যে তাতে মনে, একটি কর্তব্য সুসম্পাদন করলাম, এই ধরণের একটা তৃপ্তি আসে। এবং এটাই আমি ইবাদত বলে ধরি। এভাবে ধরতে গেলে আমাদের জীবনে প্রত্যেকটি কাজই ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে ধরা যেতে পারে বিবাহের তো কথাই নাই।

উপরোক্ত ধরনে বিবাহকে চুক্তির অতিরিক্ত একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে যে বলেছি সেটা গায়ের জোরে বলেছি বলে মনে হতে পারে, কারণ ওটা যে নিছক চুক্তি নয়, এমন কিছু আমি উল্লেখ করি নি।

এর কারণ হলো, প্রথমে আমি গায়ের জোরেই মনে করতাম, যদিও ইজাব-কবুল মুসলিম বিবাহকে চুক্তির ইঙ্গিতই দেয় তবুও এটা চুক্তির অতিরিক্ত কিছু। কিন্তু জুত মত এমন কোন তর্ক এর পক্ষে আবিষ্কার করতে পারি নি বলে বিশ্বাসটা গায়ের জোরের ধরনে থেকে যাচ্ছিল বটে, তবুও বিশ্বাস ছিল একটা যুক্তি এর মধ্যে বর্তমান রয়েছে। এবং সে বিশ্বাসের ভিত্তি ছিল এই যে, ইসলাম দৈনন্দিন জীবন পালনের জন্যে এমন একটি ধর্ম যেটা আধুনিকতম চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েও পালন করা শুধু সহজ নয়, পালন করার মধ্যে গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারলে অনির্বচনীয় আনন্দও লাভ করা যেতে পারে। সুতরাং শিকারী যেমন শিকার ধরার জন্যে ওত পেতে থাকে তেমনি তার স্বপক্ষে যুক্তি ধরার জন্যে তৈরী হয়ে রইলাম এবং শেষ পর্যন্ত পেলামও। সঙ্গে সঙ্গে আমার লেখা 'মুসলিম আইনে' সংযোজিত করলাম, এবং সেটা আদৃতও হলো। সেই কথারই কিছু আজ আপনাদেরকে বলবো।

বেইলী মুসলিম বিয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে ; "পুরুষ ও স্ত্রী এই উভয়ের মধ্যে সম্ভোগের এবং বৈধভাবে সন্তান লাভের জন্যে অবাধ ও চিরস্থায়ী যে বৈধানিক চুক্তি (সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে) করা হয়, তাকে নিকাহ্ বা বিবাহ বলে।"

যদিও এটা চুক্তি বলে কথিত হলো তবুও ওটা যে স্রেফ চুক্তিই নয়, হিন্দু কিংবা খৃস্টান বিবাহের মত নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান না হলেও তা যে ইবাদতের শামিল তা বললেন জাস্টিস আমীর আলী। কারণ, কুরআন ও হাদীসে রয়েছে, যাতে মনুষ্যগণ অপবিত্রতা এবং ব্যভিচার থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় তজ্জন্য বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে আদিষ্ট হয়েছে।

স্রেফ ধর্মীয় অনুষ্ঠান হলেই যে বিবাহ মারকেল্লা ধরনের একটা কিছু হয় তা' যেমন আমি মনে করি না, তেমনি সম্ভোগ ও সন্তান উৎপাদন করার জন্যে চুক্তিকৃত বিবাহকে তার থেকে নীচ পর্যায়ের কিছু মনে করে সেটাকে ইবাদত হিসেবে ধরে তৃপ্তি লাভের চেষ্টাকেও কোন কাজের কথা বলে ধরি না। এবং এই না ধরার একমাত্র কারণ হলো এই যে, চুক্তির ভিত্তিতেই হোক কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবেই হোক, সব বিবাহেই সম্ভোগ ঘটবেই এবং

সন্তান উৎপাদনের আকাঙ্ক্ষা থাকবেই। ইসলাম শুধু জীবন-ধর্মী বলে বিবাহের সংজ্ঞায় তার উল্লেখ রয়েছে; এইমাত্র।

চুক্তি হিসেবে মুসলিম বিবাহের যে সুবিধা; সেটা হলো এ বিবাহটা অসুবিধা হলে ভাঙ্গা যায়, যেটা আনুষ্ঠানিক হিন্দু-বিবাহে মাত্রই ছিল না; এবং খৃস্টান বিবাহে এমনভাবে ছিল যে তা পেতে গলদঘর্ম হতে হতো। ১৮৫৭ সালের আগে গ্রেট বৃটেনে প্রতিটি তালাক পার্লামেন্টের এ্যাক্ট দ্বারা সংঘটিত হতো। কোর্টের তালাক দেয়ার ক্ষমতা ছিল না। কোর্ট স্বামী-স্ত্রীকে শুধু আলাদা থাকার ব্যবস্থা করতে পারতো। এখন তাদের তালাকের ব্যবস্থা আইন দ্বারা ইসলামী তালাকের মত খানিকটা সহজ করা হয়েছে। আর ভারতে তো হিন্দু আইনে মুসলিম আইনের অনুরূপ উত্তরাধিকার আইন করা হয়েছিল। সম্প্রতি তালাকও আমদানী করা হয়েছে।

সুতরাং সারা জীবনের অবিচ্ছেদ্য সাথী গ্রহণ হিসেবে খৃস্টান কিংবা হিন্দু বিবাহের যে ধর্মীয় একটা ভাবমূর্তিছিল, সেটা এখন নেই; এবং ন্যায়তই নেই; কারণ আধুনিক জীবনে বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত দরকার। যখন দেখলাম হিন্দু ও খৃস্টান বিবাহ সোনার পাথর বাটিতে পরিণত হলো, অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতা সত্ত্বেও জাগতিক হলো, তখন মনে হলো একবার বিচার করে দেখি মুসলিম বিবাহ— যেটা সাধারণ দৃষ্টিতে ব্যবসায়ী চুক্তি বলে মনে হয়, তার মধ্যে চুক্তির অতিরিক্ত অসাধারণভাবে দেখার কিছু রয়েছে কি-না। কারণ মুসলিম আইনের সব কিছুতেই সে রকম বিচার-সহ কিছু থাকেই। এবং শেষ পর্যন্ত এই বিবাহের চুক্তি দেখলাম ব্যবসায়ী চুক্তির বহির্গত অপূর্ব এক ধরনের চুক্তি। কারণ ব্যবসায়ী চুক্তি ক্ষেত্রবিশেষে যেখানে অকৃতকার্য হতে পারে, সেখানে এ চুক্তি অটল থাকে; এবং চুক্তির সঙ্গে সঙ্গে এটা এমন অটুট হয়ে যায়, যে তার মধ্যে কোন ফাটল আবিষ্কার করা অসম্ভব।

এ দু'ধরনের চুক্তির মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তা' একে একে বলছি।

প্রথমতঃ যেকোন ব্যবসায়ী চুক্তি সাময়িককালের জন্যে হতে পারে, কিন্তু বিবাহের চুক্তি সাময়িক হলে বিবাহই হবে না। অর্থাৎ চুক্তি চিরন্তন বলেই ধরতে হবে। মুতা বিবাহ সাময়িক হলেও অল্পসংখ্যক নগণ্য ইসনা-আশয়ারীদের মধ্যে চালু, এবং সেটা প্রাগ-

ঐসলামিক যুগ থেকে হুবহু গৃহীত। তার স্থান অন্য কোন ফিরকার মধ্যে আদৌ নেই; কারণ হযরত (সাঃ) সেটা পছন্দ করতেন না।

প্রত্যেক ব্যবসায়ী চুক্তিতে (consideration) বা প্রতিদেয় থাকে; মুসলিম বিবাহে দেনমোহরকে প্রতিদেয় হিসেবে গ্রহণ করা হয় বলেই ঐ বিবাহকে চুক্তি বলা হয়। এবং এই দেনমোহর ও consideration বা প্রতিদেয়ার মধ্যে যতটা তফাত আদতে দেখা যায়, মুসলিম বিবাহও চুক্তি থেকে ততটা তফাত।

বিবাহের চুক্তি ব্যতীত যে কোন চুক্তিতে প্রতিদেয় চুক্তির সময় স্থিরীকৃত না হলে ঐ চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু বিবাহে তা' হয় না; দেনমোহর স্থির না হলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়। কারণ পরবর্তীকালেও তা স্থির করা যেতে পারে। এমনকি যদি বিবাহে কোন দেনমোহর প্রদান করা হবে না এমন চুক্তিও হয়, তা'হলেও বিবাহ শুদ্ধ হবে; কারণ পরবর্তীকালে স্ত্রীর ন্যায্য দেনমোহর আদায় করতে সেটা কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। সুতরাং চুক্তির যে অসুবিধা রয়েছে বিবাহে সেটা কার্যকরী হবে না। অথচ বিবাহকে চুক্তি ধরায় চুক্তির যে সব সুবিধা, তা গ্রহণ করা যাবে। অর্থাৎ যে সব ন্যায্য শর্ত বিবাহের চুক্তিতে প্রদান করা হবে তা' আদায় করে নেয়া যাবে এবং সে সবের খেলাফ হলে বিবাহ বিচ্ছেদও করা যাবে। স্বামীর মৃত্যুর পর চুক্তি সমাপ্ত হওয়ার মত বিবাহও সমাপ্ত হবে।

যদিও সম্ভোগ ও সন্তান উৎপাদনই বিবাহের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বলে গণ্য হয়, তবুও ইহ-জীবনে শান্তি ও স্বস্তি বিধানে সহায়তা করে বলেও ধরা হয়। কারণ অতি বৃদ্ধ বয়সে কিংবা মৃত্যুশয্যায় যখন সম্ভোগ কিংবা সন্তান উৎপাদনের কোন প্রশ্নই ওঠে না, তখনও বিয়ে করা জায়েয রয়েছে।

অনুষ্ঠানের ভিত্তিতেই মুসলিম বিবাহ আপাতদৃষ্টিতে যতটা সাধারণ মনে করার কথা, অন্যতরো দৃষ্টিতে যদি ততটা অনন্য মনে হয়, তা'হলে সম্পূর্ণ বিবাহ আইনটি (মায় তালাক ইত্যাদি) সেই দৃষ্টিতে যতটা জাগতিক মনে হবে তার অর্ধেকও যদি আধ্যাত্মিক মনে হয় তবে তার দ্বিগুণ মানবিক বলে মনে হবে। কারণ অন্যান্য ধর্মের বিবাহের আইনও এইমুখো হয়ে চলছে দেখা যায়।

দৈনিক আজাদ
২৬. ১১. ৭৮

'তিথি-নক্ষত্র দ্বারা ভাগ্য নির্ধারিত হয়', এ বিশ্বাস এবং 'শবে বরাতের রাত্রে আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়' এ বিশ্বাস, এ দুটো বিশ্বাসই আলাদা প্রকৃতির। অবশ্য যিনি এই দুটোতেই বিশ্বাস করেন তিনি এ দুটোর মধ্যে যে কত বড় প্রভেদ রয়েছে তা অনুভব করতে পারেন না। কারণ, এ দুটো বিশ্বাসই তাঁর কাছে বস্তুত অন্ধ বিশ্বাস।

তবে বুদ্ধি দিয়ে যদি কোন বিশ্বাসকে মনে গ্রহণ করার মত করে পাওয়া যায়, তবে সেটা অদৃশ্য থাকলেও সে বিশ্বাসকে অন্ধ বলা যায় না। আমি যতদূর ইসলাম ধর্মকে রপ্ত এবং ইসলাম সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে নিজের মধ্যে ধর্ম-বিশ্বাসকে আত্মস্থ করতে পেরেছি তার ভিত্তিতে আমি বলতে পারি যে, শবেবরাতে যে ভাগ্য নির্ধারণের কথা রয়েছে, সেটা সাধারণ মানুষের সাধারণভাবে বুঝার মত। এবং যেহেতু ইসলাম সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সর্বতো-ভাবে পালন-উপযোগী একটি ধর্ম, সে জন্যে বলা যায় সাধারণ মুসলমানের সাধারণভাবে বুঝার মত।

ইসলাম যে তকদিরে বিশ্বাস করে সে তকদির অনড় এবং আল্লাহ্ নিজ হাতে রেখেছেন। যেমন : সূর্যের কক্ষপথে আবর্তন, (সূরা ইয়াসীন : ১৮) মানুষের মৃত্যু (সূরা ওয়াকেয়া : ৬০), এবং আল্লাহ্ নিজ ইচ্ছায় ভালোমন্দ যা ঘটাতে চান (সূরা ইউনুস, : ১০৭; সূরা যুমার : ৩৬)। এই ধরনের তকদির ছাড়া আল্লাহ্ মানুষের ভাগ্য নির্দিষ্ট করেও বলেছেন যে, একটা পরিমাপ পর্যন্ত তারা যেতে পারে, তার অধিক নয় (সূরা কমর, : ৪৯; সূরা ফুরকান, : ২)।

অর্থাৎ ইসলাম তকদির অর্থাৎ pre-destinetion-এ বিশ্বাস করলেও, ক্ষেত্রবিশেষে pre-measurement-এও বিশ্বাস করে। অর্থাৎ

পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী মানুষ তার ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট ছকের মধ্যে পরিবর্তন যে করতে পারে তাতেও বিশ্বাস করে। অর্থাৎ হায়াত, মউত, রিযিক, দৌলত আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে; এ-ও যেমন বিশ্বাস করে তেমনি এও বিশ্বাস করে যে, সেগুলোতে আমরা পৌঁছি আমাদের কর্মপন্থার মাধ্যমে। শবেবরাতে আমরা আমাদের ভাগ্য ভালো করার জন্যে আল্লাহ্‌র নিকট যে, প্রার্থনা করি, তার মধ্যে মনে করি এই দোয়া থাকা উচিত : আল্লাহ্! তুমি আমার ভাগ্য উন্নত করো এবং সেটা উন্নত করার জন্যে আমার নিজের প্রচেষ্টা করার এবং তোমার উপর ভরসা রাখার তৌফিক দাও।

হায়াত, মউত, রিযিক, দৌলত, এ চারটি যে আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে এটা বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের একান্ত কর্তব্য হলেও মানুষের সেগুলোর প্রতি করণীয় কোন কিছু নেই, তা মনে করাও ঠিক নয়। মনে রাখতে হবে আল্লাহ্ মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত—পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, যে ধর্মেরই সে মানুষ হোক না কেন, আল্লাহ্ তাকে বুদ্ধি দিয়েছেন, কাজ করার শক্তি দিয়েছেন। সে সেই বুদ্ধি খরচ করে কাজ করে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির গৌরব বৃদ্ধি করবে, এটাই আল্লাহ্ চান।

শুধু একচ্ছত্র ইবাদত করে যাবে তা চান না। তা হলে তো মানুষ সৃষ্টির প্রয়োজন হতো না ফেরেশতা দিয়েই আল্লাহ্‌র চলতো। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন যে, মানুষ ইবাদতও করবে এবং শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে কাজও করবে। মুসলমানের একটা সুবিধা তার প্রত্যেকটি ভালো কাজও ইবাদত।

সুতরাং হায়াত, মউত, রিযিক, দৌলত—এইগুলো আল্লাহ্‌র হাতে থাকলেও, এর প্রেক্ষিতে কাজ করে এগুলো আল্লাহ্‌র ইচ্ছামত আমাদের জীবনে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের ইবাদত করার মওকাও আল্লাহ্ দিয়েছেন।

মউত সম্বন্ধে ধরা যাক প্রথমে। কারণ ধরতে গেলে মউতকে হায়াতের উল্টো পিঠ বলা যেতে পার।

এটা আলোচনার আগে একটা কথা বলা দরকার। সেটা হলো, আমি নিজেকে একজন খাঁটি মুসলমান মনে করি। কারণ, আমি মনে

করি মাটির স্তরের মানুষের খাঁটি মুসলমান হওয়াটা খুব সোজা। কেননা আদিতে ইসলামের সব মহাপুরুষই এই মাটির মানবের স্তরের ছিলেন, তখন পর্যন্ত পাণ্ডিত্য দিয়ে ধর্মকে জটিল করা হয়নি। তাঁরা প্রত্যেকটি ভালো কাজকে ইবাদত মনে করতেন; নামায-রোযায় যতটা সময় দেয়া দরকার, তাই দিতেন মাত্র ; বাকী সময় শাসন, ধর্ম যুদ্ধ ও অন্যান্য সাংসারিক যে কর্তব্যকাজ রয়েছে, তা করতেন। কারণ সেগুলোও ইবাদতের শামিল ধরা হোত।

এই ধরনের খাঁটি মুসলমান হিসেবে আমি মউত সম্বন্ধে যে কথা বলতে চাইছি তা এই ঃ

ইদানীং পৃথিবী থেকে যে বসন্ত নির্মূল করা হয়েছে। সেটাতে কি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচারণ করা হয়েছে? মোটেই নয়, আমি মনে করি। বরং আমি মনে করি এটা ইবাদতের শামিল ধরা হবে। এই যে নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কার করা হয়েছে, এটাও ইবাদত। কারণ আল্লাহ্‌ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। এই ঔষধে অমুক বাঁচবে।

এই যে সেদিন জনৈক জনাব আমান উল্লাহ্‌কে মৃত্যুমুখ থেকে বাঁচানোর জন্যে আটজন উদারপ্রাণ লোক তাঁদের কিডনী দান করতে রাজী হয়েছেন, তাঁরা কি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, না ইবাদত করছেন? নিশ্চয় তাঁদের মতো তাঁরা ইবাদত করছেন। "তাঁদের মতো তাঁরা ইবাদত করছেন"-এর অর্থ হলো তাঁকে বাঁচানো আল্লাহ্‌র হাতে। তবে তাঁদের কিডনী দান করার প্রস্তাবটাও ইবাদতের শামিল, তাই তাঁরা করেছেন। এখন তাঁকে বাঁচাবেন কি না বাঁচাবেন, তা একমাত্র আল্লাহ্‌ জানেন। অর্থাৎ এইভাবেই আল্লাহ্‌ শেষটায় হায়াত-মউত তাঁর হাতে রাখেন অর্থাৎ মানুষকে চেষ্টা করতে বলেন; কিন্তু ফল রাখেন নিজের হাতে।

রিযিক-দৌলত সম্বন্ধেও সেই কথা। ধরুন, ক ও খ দু'জন বিত্তহীন লোক একত্রে চাকরিতে ঢুকেছিলেন প্রায় বিশ বছর আগে। দুইজনই বর্তমানে দু' হাজার টাকা করে বেতন পাচ্ছেন। ক-এর একটি ছেলে ও একটি মেয়ে; তাদেরকে তিনি ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, ছোট্ট একটা বাড়ীও করেছেন; তাতে তিনি আছেন, একটা শান্তিপূর্ণ জীবন-যাপন করছেন। আর খ চারটি বিয়ে করেছেন। তাঁর

চারপক্ষে আঠারোটি সন্তান হয়েছে। ভালো চাকরি করে ঠেসে বিয়ে করেছিলেন। জমাজমি করা দূরে থাকুক, এত বড়ো অফিসারের ছেলে-পেলেরা না পেয়েছে তেমন শিক্ষা, না পাচ্ছে পেট ভরে খাবার। এ রকম দুটো ছবি যদি আপনি কল্পনা করতে পারেন, তা হলে এ ধরাও কঠিন নয় যে, আল্লাহ্ তাঁদের ভাগ্যে যেটা লিখেছিলেন, তাঁরা তা নিজেই সৃষ্টি করেছেন তাঁদের কর্মের মাধ্যমে।

পাকিস্তান ভেঙে যে স্বাধীন বাংলাদেশ হবে এটা সে বছর শবেবরাতে আল্লাহ্ বাংলাদেশের ভাগ্যে লিখেছিলেন, এটা যেমন ঠিক, তেমনি আল্লাহ্ ঠিক ধরে রেখেছিলেন তদানীন্তন পাকিস্তানী কর্মকর্তা-দের নৃশংস সব কার্যকলাপের মধ্যমে এটা আসবে।

আবার বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যে একটা বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে, এটা যেমন আল্লাহ্‌র দরবারে লিখিত হয়েছিল, তেমনি লিখিত হয়েছিল যে, এটা এমনিতেই হবে না, এটা হবে চোরা-কারবারী, মুনাফাখোরী, রাহাজানী, স্বজনপ্রীতি ও নেতাদের অসম্ভব-রকম স্বার্থসিদ্ধি হাসিল করার চেষ্টার মাধ্যমে।

গতবার শবেবরাতে আল্লাহ্ গত বছরের জন্যে আমাদেরকে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচার যে সুযোগ দিয়েছিলেন, সেটাও এইজন্যে যে, আমাদের দেশের সবারই কার্যকলাপ সেই খাতেই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বয়ে এসেছে।

এবার শবেবরাতে আল্লাহ্ আমাদের ভাগ্যে কি লিখবেন তা তিনিই জানেন। তবে আমরা যদি দেশকে, দেশের মানুষকে ভালবেসে আমাদের কার্যকলাপ ঠিকমত করে যেতে পারি, যা ইবাদতের শামিল হয়, তা হলে ইনশা আল্লাহ্ আমাদের আগামী বছর আরো সুখ ও শান্তিময় হতে পারে।

আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে, হায়াত, মউত, রিযিক, দৌলত আল্লাহ্‌র হাতে থাকলেও তাঁর হাতের পুতুল হিসেবে আমাদের সেগুলোর ব্যাপারে অনুকূল ফল লাভ করতে হলে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সৎকাজে আমাদেরকে নিয়োজিত রাখতে হবে।

সুতরাং আমাদের শবেবরাতের দোয়া এই হওয়া উচিত "আল্লাহ্! আমাদের দেশকে স্বাধীন রেখো, আমাদের দেশবাসীকে সুখী রেখো এবং সেজন্যে আমাদের প্রত্যেককে কর্তব্য-কর্ম করার শক্তি দাও।"

তারপর নিজের জন্যে প্রার্থনা করতে হবে। কারণ অন্যের জন্যে প্রার্থনা না করলে নিজের জন্যে প্রার্থনা আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হয় না। এটা এতদিন শুনেছিলাম, কিছুদিন থেকে অনুভবও করতে পারছি। সবার উপরে আল্লাহ্‌র কাছে সবর করার শক্তি প্রার্থনা করতে হবে। কারণ আমাদের রাতারাতি বড় হওয়ার কিংবা রাতারাতি বড় লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা এত পেয়ে বসেছে যে, সেটাই সবচেয়ে মারাত্মক হয়ে দেখা দিচ্ছে। এবং সব কিছুর গোড়ায় যে গলদ দেখা দেয় সেটা বিশ্লেষণ করলে নিশ্চিতভাবে দেখা যাবে সে গলদ সৃষ্টি হয়েছে সবর বা ধৈর্যের অভাবে। 'ধৈর্য যার রয়েছে আল্লাহ্ তার সহায় হন,' এই হলো কুরআনের বাণী। এবং এই বাণী অনুসরণ করে নিজের কাজ করে করে যে ফল লাভ হয় ; সেটাই তাকে মেনে নিতে হবে, কারণ এটাই হলো ইসলামী মতে মানুষের ভাগ্য, যেটাকে তকদির বলা গেলে ও কর্মপন্থায় পরিবর্তনশীল।

দৈনিক আজাদ
৮. ৭. ৭৬

পাটনা (ভারত) ১৯শে অক্টোবর,

নিখিল ভারত মুসলিম আইন বোর্ড গৃহীত এক প্রস্তাবে স্পষ্ট-ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুসলিম আইনে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ মুসলমানের নিকট গ্রহণযোগ্য হইবে না।

সম্প্রতি রাঁচিতে অনুষ্ঠিত বোর্ডের দুইদিনব্যাপী এক সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। বোর্ডের সেক্রেটারী শেখ আবদুস সাত্তার ইউসুফ আজ এখানে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

—(বাসস/সমাচার)

এই সংবাদটি আমি যে দৃষ্টিতে দেখছি, সেটা যে সম্পূর্ণ অন্যতরো দৃষ্টি, সেই সম্বন্ধেই আজ বলবো।

আমি মুসলিম আইন, মানে ব্যক্তিগত আইন, যেটা ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বৃটিশ আমল থেকে চলে আসছে, সে সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, এই আইন যে ঠিক মত উপলব্ধি করেছে তার কাছে এটা সর্বশ্রেষ্ঠই শুধু নয়, চিরন্তন আইন বলেও মনে হবে। সুতরাং এতে হস্তক্ষেপ করার অবকাশ নেই বলে আমি মনে করি। তবে যে আমি বললাম ঠিক মত উপলব্ধি করার কথা, সেটাই হলো আসল। ভারত কয়েক বছর আগে মাত্র হিন্দু উত্তরাধিকার আইন যেভাবে পরিবর্তন করেছে তাকে হুবহু মুসলিম আইনের প্রতিচ্ছায়া বলা যেতে পারে। আমার যতদূর মনে আছে, প্রফেসর হুমায়ুন কবীর তখন বলেছিলেন যে, এত দিন পরে ভারত উত্তরাধিকার আইনে মুসলিম আইনের নীতি গ্রহণ করেছে। মা-বাবা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এদের জন্যে যে ভালবাসা, সেটা সার্বজনীন এবং সর্বকালের। এদের জন্যে ভালবাসার যে তারতম্য, তাও সার্বজনীন ও সর্বকালের বলা যেতে পারে।

এবং এই ভালবাসার পরিমাপ অনেকটা যে বুদ্ধি দিয়েও করা হয় সেটাও সর্বকালের বলা যেতে পারে। সুতরাং মুসলিম উত্তরাধিকার আইন যেটা আল্লাহ্ প্রদত্ত, সেটা এতটা এই ভালবাসা ও বুদ্ধিভিত্তিক যে, তা' আমার মনে হয় সার্বজনীন ও সর্বকালের উপযুক্ত।

ধরুন বিবাহ না হওয়া পর্যন্ত একজন তার মা-বাপকে সব চাইতে বেশী ভালবাসে। সে অবস্থায় সে-মারা গেলে তাঁরাই সম্পূর্ণ সম্পত্তি পাবেন। তবে মার চাইতে বাবা অনেক বেশী পাবেন, কারণ সূক্ষ্মভাবে বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে দেখতে গেলে, মার চাইতে বাবার বেশী পাওয়া উচিত, এ জন্যে যে, কারণ বাবারই দায়িত্ব মা'কে ভরণ-পোষণের। বিয়ে করলে মা-বাবা ছাড়া পুরুষ হলে স্ত্রী তার ভালবাসা পায়, স্ত্রী হ'লে পুরুষ। সেই জন্যে স্ত্রী কিংবা স্বামী থাকলে মা-বাবার সঙ্গে তারাও পাবে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বামীর ভাগটা বেশী হ'বে হয়তো এই জন্যে যে, স্ত্রীর সম্পত্তি প্রায় সর্বত্রই স্বামীর সাহায্যেই লব্ধ হয়। কিন্তু ছেলে-পুলে হ'লে মা-বাবা-স্বামী কিংবা স্ত্রীকে অল্প অল্প দিয়ে বাকীটা তারাই পাবে। যতদিন পৃথিবীতে ভালবাসা থাকবে, বুদ্ধি থাকবে, ততদিন এটা চালু থাকবে।

Macnaghten বলেছেন, "এই বিধিসমূহের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকৃতি আমাদের ভালবাসার ক্ষেত্রে যাহাদিগকে অধিষ্ঠিত করিয়াছে তাহাদের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে, বস্তুত ইহা বলা যায় যে, এইরূপ নির্ভুলভাবে ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য একটি আইনের তন্ত্র কল্পনা করা সুকঠিন।"

কিন্তু এই আইনের আমরা চট করে দোষ ধরতে যাই তখন, যখন এটা ঠিক বিচার করার বুদ্ধি হারিয়ে ফেলি।

ধরুন এটা আপনারা জানেন যে, ক জীবিত থাকাকালীন তার দু'টি ছেলে খ ও গ-এর মধ্যে গ ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেল। এরপর ক যদি মারা যায় তা'হলে গ-এর সন্তানেরা কিছুই পাবে না। এ অতি খারাপ কথা;—আপনাদের মনে হবে।

তা'হলে এর প্রেক্ষিতে একটি ঘটনার কথা বলি। আমি মুসলিম আইনের এই ধারাটা তখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলাম। একটি ছেলে আমাকে

বললো, "স্যার এটা কি ন্যায্য?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "ন্যায্য নয় তুমি কেন জিজ্ঞেস করছো?"

সে বললো, "আমি ভুক্তভোগী। আমার দাদা যখন বেঁচেছিলেন তখন আমার বাবা, মারা যান। সুতরাং দাদা মারা গেলে তাঁর সম্পত্তি আমরা পাই নি।" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তিনি কি কোন উইল করেও যান নি?" তখন সে স্বীকার করলো যে, তাদেরকে সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ অবশ্য উইল করে গেছেন। আরও জিজ্ঞাসাবাদ করে জানলাম—তার চাচারা চার ভাই জীবিত রয়েছেন। তখন আমি বললাম, "তা' হ'লে তো তোমার বাবা আগে মারা যাওয়ায় বেশী অংশ তোমরা পেয়েছ।" যদি ছেলেটির বাবা মারা না যেতেন তা'হলে তারা এক-পঞ্চমাংশ মাত্র পেত; কারণ তাদের পক্ষে উইল করলে সেটা বাতিল হয়ে যেত। এইখানেই মুসলিম আইনের ন্যায়-নিষ্ঠতা। এক-হাতে নেয় তো অন্য হাতে দেয়! এ ক্ষেত্রে উইলটা ঠিক মৃত্যুর মতই, মৃত্যুর পরে কাজ করতে পারে। এবং প্রত্যেক পিতামহ যে পুত্র মারা গেছে, তার অসহায় সন্তানদের জন্যে দুঃখ অনুভব করবেনই। এবং তা' করলেই তাদেরকে জীবিত অবস্থায় দান করার প্রয়োজনও হয় না, হ'লে নানা অসুবিধা হতে পারে হয়তো। কিন্তু নির্দ্বিধায় উইল করে তার ঐ পৌত্র-পৌত্রীদিগকে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি তিনি অনায়াসে দিয়ে যেতে পারেন, এবং সেটা তাঁর মৃত্যুর সময় থেকেই অর্থাৎ অন্য সকলের অংশ প্রাপ্তির সময় হতেই কার্যকরী হতে পারে।

আইউব খানের সময় যে পারিবারিক আইন তৈরী হয় তাতে ঐ সব পৌত্র-পৌত্রীদেরকে আইন করে পিতার অংশ দেয়া হয়েছে, এবং এমন সরাসরিভাবে দেয়া হয়েছে, যাতে মনে হতে পারে মুসলিম আইনকে ন্যায়ত লঙ্ঘন করা হয়েছে। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত মত এই যে, সেটাই মনে হতো না; যদি ঐ আইনে সরাসরি ঐ ভাবে না বলে বলা হতো: "কাহারও যদি পুত্র কিংবা কন্যা তাঁহার সম্মুখে মারা যান তাহা হইলে তাঁহার ঐপুত্র কিংবা কন্যার অংশ তিনি যেন উইল করিয়া তাহাদেরকে দিয়া গেছেন ধরিতে হইবে; এবং সেইভাবে সম্পত্তি বন্টন হইবে।"

একই কথা, কিন্তু মনের উপর তাছির ভিন্ন হতো। ঐ পৌত্র-পৌত্রীদেরকে তাদের পিতামাতা বর্তমান থাকতে, পিতামহ যেমন

উইলক্রমে কোন অংশ দিতে অক্ষম থাকেন তাহাদের মৃত্যু হওয়ার পর তেমনি সক্ষম হন। সুতরাং শুধু উইলের কথা উল্লেখ করে যদি তা' ঘটান যায় তবে নির্দ্বিধায় তা গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না।

এখন চিন্তা করা যাক; মুসলিম আইনে হস্তক্ষেপ করার কথা যে ভারতে বলা হয়েছে, তা কিসের উপর হতে পারে বলে ধরা হয়েছে।

আমাদের পারিবারিক আইন; যার কথা এইমাত্র উল্লেখ করলাম, সেটা কিন্তু ভারতে চালু নেই। এবং সেটা যদি ভারতে এখন চালু করতে চায় তা হলে সেটাকে একটি বড় ধরনের হস্তক্ষেপ করা বলে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত তিন তালাক, যেটা একই সঙ্গে তিনবার বলে ফাইন্যাল করে ছেড়ে দেয়া হয়; যাকে 'বিদাত তালাক' বলা হয়, কারণ সেটা ধর্ম-বিগর্হিত। তার যে পরিবর্তন আমাদের এখানে সাধিত হয়েছে তা সেখানে করার চেষ্টাও করা যেতে পারে। অর্থাৎ তিন তালাকে বায়েন দেওয়ার পরও স্ত্রীকে তিন মাসের মধ্যে আবার আপোষ করে যে ঘরে আনা যেতে পারে, সেটা ভারতে এখনও করা হয় নি। আগের আইন ছিল ঐ স্ত্রীকে অন্যে বিবাহ করে সম্ভোগ করার পর তাকে তালাক দিলে, ইদ্দতকাল পার হওয়ার পরই কেবল পূর্বের স্বামী তাকে বিবাহ করে ঘরে আনতে পারবে। এই তালাক সুন্নাহর তালাক নয়। এ তালাকের তো কথাই হতো না। এ তালাক হিজরীর দ্বিতীয় শতাব্দীতে উমাইয়া সম্রাটগণ কর্তৃক সুবিধামত প্রচলিত করা হয়। পারিবারিক আইনে তালাক-ই-সুন্নাহর তিন তুহরের দিকে দৃষ্টি রেখেই আপোষের জন্যে তিনমাস তাই সময় রাখা হয়েছে। এটাও ভারতে প্রচলিত করার চেষ্টাকে হস্তক্ষেপ করার শামিল ধরা যেতে পারে।

তৃতীয়ত যে হস্তক্ষেপের কথা বলা যেতে পারে, যেটা আমাদের এখানে, স্ক্রুর একটা প্যাঁচ কষার মত হয়ে আছে, সেটা হলো একাধিক বিয়ে। পারিবারিক আইনে একাধিক বিয়েতে যে বাধা প্রদান করা হয়েছে সেটা আমাদের এখানে পূর্বে মোটেই ছিল না।

খোশ-খেয়ালে যে কোন মুসলমান পুরুষ চারটি বিবাহ করতে পারতো। এখনও পারে, তবে তার 'খোশ-খেয়ালের' উপর বাধা দেয়া হয়েছে। তার আগের স্ত্রীর অনুমতি চাই; তাকে না পটিয়ে বিয়ে

করলে ফ্যাসাদ রয়েছে। কুরআনে চার বিয়ে করার যে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে, তা কোন ফযীলত হিসেবে তো নয়ই; বরং এত কড়া শর্তে দেয়া হয়েছে যে, আমি চার বিয়ে করা যাদেরকে দেখেছি তারা সবাই সে শর্তের ব্যত্যয় ঘটিয়েছেন। চার বিয়ে তখনই একজন করতে পারেন, "যখন তিনি সকল স্ত্রীর সাথে পক্ষপাতশূন্যভাবে এবং ন্যায়-পরায়ণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে সক্ষম হন।" কিন্তু কোন ক্ষেত্রে তা' দেখা যায় না। পারিবারিক আইনে প্রথম স্ত্রীর অনুমতির যে শর্ত দেয়া হয়েছে, তাতে অনেকটা কার্যকরীভাবে এই পক্ষপাতশূন্যতা কিংবা ন্যায়পরায়ণতা হাসিল করা যেতে পারে। ধরুন, একজন যখন তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ করেন না বলেই অন্য স্ত্রী গ্রহণ করছেন, কিংবা মোহগ্রস্ত হয়েই অন্য স্ত্রী গ্রহণ করছেন, তখন তাঁর আগের স্ত্রীর দিকে মানসিকভাবে ন্যায়পরায়ণতা কিংবা পক্ষপাতশূন্যতার প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী যদি তার কাছ থেকে অনুমতি দেয়ার জন্যে একটা বাড়ী লিখিয়ে নেন যার দ্বারা তার আর্থিক অবস্থা এমন হয় যে স্বামী নতুন বৌকে হাজার ভালবাসলেও আথিক ব্যাপারে তারতম্য ঘটাতে পারবেন না, তা' হলে কার্যকরীভাবে ন্যায়পরায়ণতা ও পক্ষ-পাতশূন্যতা তাতে এসে যায়। এই অনুমতি না নিলে স্বামী ভদ্রলোকের জেল খাটতে হতে পারে। তাই বলছিলাম পারিবারিক আইনে একাধিক বিবাহ রোধ করার প্রচেষ্টায় স্ক্রুর একটা প্যাঁচ কষা হয়েছে মাত্র।

এবং এই কথা আমি এই জন্যে বলছি, যে-সব গরীব-দুঃখীদের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে আমরা প্রগতিশীল লেখক বলে আদৃত হচ্ছি, তাদের মধ্যে আজকাল বিয়ে করে সন্তানসহ বৌকে ফেলে গিয়ে অন্য একটা বিয়ে করার প্রবৃত্তি এমন অধিক দেখা যাচ্ছে যে, এই স্ক্রুর প্যাঁচ পুরোপুরি কষে তাদের জেলের ভাত খাওয়াতে না পারলে কুরআনে একাধিক বিবাহের সত্যিকার নির্দেশ কোন ক্ষেত্রে রক্ষিত হবে না।

ভারতে হিন্দু আইনে একাধিক বিয়ে সবক্ষেত্রেই আমার যতদূর মনে পড়ে, না-হলে ক্ষেত্রবিশেষে তো বটেই, নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এবং সেটা মুসলিম আইনের ক্ষেত্রেও চালু করার প্রচেষ্টা হতে পারে। হ'লে সেটাও হস্তক্ষেপ ধরা যেতে পারে।

প্রথমে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে তাতে হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র কি, তা বলা হয় নি। সুতরাং সে সম্বন্ধে না জেনে কিছু বলা মুশ্‌কিল। তবে আমি এ সম্বন্ধে নিশ্চিত যে, বাইরের কোন হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় না, কারণ কুরআনে ও হাদীসে যে বিধি-নিষেধ রয়েছে, যার দু'একটা উদাহরণ উপরে দেয়া হলো, তা আমরা যদি অক্ষরে অক্ষরে পালন করি, তা হলে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন হস্তক্ষেপ ব্যতীত সর্বাধুনিক বলে প্রমাণিত হতে পারে। এটা আমি ইন্‌শা আল্লাহ্ প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখাতে পারি।

দৈনিক আজাদ
২৩. ১০. ৭৭

ধর্মের সব সত্যই অবশ্য বিশ্বাসের উপর ভিত্তিমান। অর্থাৎ বিশ্বাস হ'তে চায় না, এমন কোন কিছু পেলেও তা তর্ক দিয়ে যাচাই না করে সরাসরি বিশ্বাস করে নিতে হয়। যদি কেউ তা না পারেন তবে তার জন্যে সেটা ব্যত্যয় হিসেবে ধরা হবে। কারণ ধর্মের এই মানাটা অন্ধবিশ্বাস নয়, এটা একটা discipline, ধর্মের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। হিন্দুমতে এটাকে সুন্দর করে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, 'বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।'

এবং মানুষের মনকে এই তর্কবিহীন নিয়মানুবর্তিতা দেয়ার জন্যেই বোধ হয় প্রত্যেক ধর্মেই এমন কোন না কোন ঘটনা রয়েছে যা' বিনা দ্বিধায় তাকে মেনে নিতে হয়, শুধু তার ধর্মকে দৃঢ় করার জন্যে নয়, তার চরিত্রকেও দৃঢ় করার জন্যে।

কোন কিছুতে অগ্রসর হওয়ার জন্যে যদি কোন প্রকার স্কীম দ্বারা প্রচেষ্টা করা হয়, আর সেখানে যদি তর্কের অবকাশ দেয়া হয় তা' হ'লে সেটাকে যেমন মানুষে তর্কে তর্কে ধ্বংস করবে, তেমনি ধর্মেও তর্কের অবকাশ দিলে ধর্মও তেমনি তাদের হাতে বিনষ্ট হবে।

ধর্মে এ ধরনের বিশ্বাস নিয়ে আধুনিক জগতে চলতে কোন বাধা নেই। একটা ঘটনা বললে বুঝতে পারবেন। অনেক দিন আগে, যতদূর মনে পড়ে কোন সেপ্টেম্বর মাসে, আমি আমার এক ইংরেজ বন্ধু পিটার আর্চারের সঙ্গে তাদের বাড়ী ওয়েনস্‌বেরীতে যাই। ওয়েন্‌সবেরী বার্মিংহাম থেকে পনের মাইল দূরে একটি ছোট্ট শহর। আমার বন্ধুটি একজন আধুনিক ছাত্র-নেতাই শুধু ছিল না, অর্থাৎ সে নাচ, গান ও অন্যান্য সব ধরনের পার্টিতেই শুধু প্রাধান্য লাভ করতো

তাই নয়, সে একজন অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রও ছিল ; এবং এম. এস. সি-তে সাইকোলজিতে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল।

আমি যখন তাদের বাড়ীতে যাই তখন ফসল কাটার সময় ছিল। সেই জন্যে তাদের, আমাদের এখানে আগে যেমন সিন্নি কিংবা নবান্ন উৎসব হয়, তেমন সপ্তাহব্যাপী উৎসব হচ্ছিল।

উৎসবের ধারা ছিল এই, প্রথমে গির্জায় প্রার্থনা করা হতো; প্রভু আমাদের এই যে খাবার দিয়েছেন এর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুকরিয়া জানানো হতো। তারপর খানাপিনা সেরে সারারাত নাচ-গান হতো। আমি পিটারের সঙ্গে গির্জায় গেলাম এবং প্রার্থনা শুনলাম, অপূর্ব লাগলো। কারণ বাইবেল থেকে বেছে বেছে মানুষের জন্যে আল্লাহ্ যা' করেছেন তা এমন চমৎকার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে যাজক বলছিলেন যে, মন সিক্ত হয়ে যাচ্ছিল। তাঁর বলার মধ্যে এমন অনেক কিছু ছিল যা সাধারণত বিশ্বাস করা কঠিন ছিল। আমি পিটারকে লক্ষ্য করছিলাম, দেখতে চাইছিলাম এইসব ঘটনার উল্লেখের সময় তার মুখের উপর কি প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। দেখলাম অনির্বচনীয় ভাব।

প্রার্থনা শেষে আমি পিটারকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐসব ঘটনার যে চমৎকার আধুনিক ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, তা তারা চিন্তা করে দেখেছে কি ? তখন পিটার এত আশ্চর্য হয়ে গেল যে, আমাকে তা অবাক করলো। পিটার বললো "কেন মোমেন, আধুনিক করবে কেন? এই নিয়েই তো আমাদের বিশ্বাস। ধর্মমতে বিশ্বাস করার যা, তা আমরা করবোই। জীবন-যাপন তো অন্য জিনিস, ধর্ম তাতে বাধা সৃষ্টি করবে কেন ? ধর্মে অন্ধ-বিশ্বাস বলে কিছু নেই, সবই সত্যিকার বিশ্বাস।"

আমি এ কথা শুনে চমৎকৃত হলাম শুধু এই জন্যে যে, আমাদের এখানে, আমরা যতই বাহাদুরী করি, যতই নিজেদের বস্তুতান্ত্রিক কিংবা আধুনিক মনে করি, আমরা ওদের কাছে তো বটেই, এমন কি অন্যের তুলনায়ও ব্যাকওয়ার্ড, অনুন্নত জাতি। আমাদের বস্তুতান্ত্রিক অগ্রগতি তো ওদেশের তুলনায় কিছুই নয়, সুতরাং ধর্মের গুড়ে বালি দিয়ে অগ্রগতির ভড়ং দেখাই ধর্মকে তাচ্ছিল্য করে। কারণ কিছু কিছু

অগ্রগতিপ্রাপ্ত দেশ ধর্মকে তাচ্ছিল্য করেছে, সুতরাং আমরা মনে করি ধর্মকে তাচ্ছিল্য করলে অন্তত প্রগ্রেসিভ কওলাতে পারবো।

আমেরিকা যেখানে অগ্রগতির পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে সেখানে তাদের ধর্মের প্রতি তাদের মানসটা একবার বিচার করে দেখুন তা'হলে বুঝবেন। এ্যাপোলো থারটিনকে যখন চাঁদে পাঠানো হলো, এবং তারা তাদের ব্যর্থ হ'বার খবর পেল, এবং যখন দেখা গেল এ্যাস্ট্রোনটদের জীবন বিপন্ন, তখন থেকেই গির্জায় গির্জায় তাদের জন্যে প্রার্থনা হ'তে লাগলো। এবং যেদিন তারা নিরাপদে পৃথিবীর বুকে নামলো, সেদিন দেশব্যাপী 'থ্যাঙ্কস্ গিভিং' প্রার্থনা অনুষ্ঠিত করে আল্লাহ্‌র দরগায় শুকরিয়া জানালো। সুতরাং আমাদের এখানে যাঁরা ধর্মকর্ম করছেন না, তাঁরা তাঁদের প্রগ্রেসিভ ভাব দেখানোর জন্যে ঐ একটাই সম্বল আছে বলে তাই করেন। তাঁরা মনে করেন ধর্মকর্ম করলে সাম্প্রদায়িক হয়। এটা খুবই ভুলে মনে করেন; এবং কতদূর ভুল মনে করেন, তা আমার নিজের একটি উদাহরণ দিয়ে আমি কোন একটি লেখায় দেখাব। গরীবের প্রতি দু'চার কলম লিখে তাঁরা মনে করেন খুব প্রগ্রেসিভ, সেটাও যে কত ভুল তাও অন্য কোন সময় বলবো। আজ তাঁদের সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, তাঁরা মনে করেন নিজেদের খাওয়া দাওয়া সুখ-শান্তির সাজ-সরঞ্জাম ঠিক রেখে চুটিয়ে ব্যতিক্রমী কথা বলে প্রগ্রেসিভ বনে যাবেন। অথচ তাঁদের নিজেদের জীবনে বেশীর ভাগই ব্যতিক্রমী কিছু করতে ভয় পান। পাবেনই, কারণ তাদের ভিত্তিতে আসল জিনিস; দেশজ, কিছুই নেই, যা ভিত্তিকে শক্ত করে। বিদেশী আইডিয়ার বিমূর্ত রূপকে সম্বল করে যে তৃপ্তি লাভ করতে চেষ্টা করেন সেটার যে কোন দাম নেই তা' বোঝেন না।

ধরুন, যিনি ড্রয়িং কিংবা রিয়ালিস্টিক ছবিতে পারদর্শী নন তাঁর বিমূর্ত ছবির কোন দাম নেই। তথাপি বিমূর্ত ছবি হলো প্রগ্রেসিভ।

এবং এই ড্রয়িং কিংবা রিয়ালিস্টিক ছবিতে যারা ভাল, তাদেরকে এঁরা, বিমূর্ত ছবি আঁকেন না বলে যদি তাচ্ছিল্য করে নিজেদেরকে প্রগ্রেসিভ মনে করেন, তা হ'লে তা' ঠিক তেমনি হবে, যেখানে কম্যুনিস্ট

দেশগুলি যে খাটুনি খেটে নিজেদেরকে উন্নত করেছে, সেটা না বুঝে, এবং এরা খাটুনীর ধার দিয়ে না গিয়ে ৫৫৫ সিগ্রেট ধরিয়ে গরীবদের সম্বন্ধে চটকদার কিছু লিখে নিজেদেরকে অগ্রগতিপ্রাপ্ত বলে মনে করেন।

মজার কথা হলো, এঁদের কলমে যাই থাকুক, কাগজে জোর আছে। অর্থাৎ বহু কাগজ আছে মত প্রকাশ করার। সুতরাং যে যাই মনে করুক না কেন, তাঁরা নিজেদেরকে প্রগ্রেসিভ মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করাটা চালু রাখতে পারেন। এঁদের যদি ধর্মকর্ম করা থাকতো; তা' হলে এরা বুঝতে পারতেন এই প্রগ্রেসিভ মনে করাটা তাদের একটা inferiority complex—কারণ ধর্মের কথা বলনেওয়ালারাও বহু প্রগ্রেসিভ আছেন। ধরুন বেগম সুফিয়া কামালের কথা। তাঁর ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে যে যাই বলুক, আমি মনে করি তিনি নিসঃন্দেহে প্রগ্রেসিভঃ কারণ আধুনিক ভাবধারার তিনি পক্ষপাতি, আবার ইসলামও তাঁর অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি লেনিনের জন্ম দিনে বক্তৃতা দিতে গিয়ে হযরত মুহম্মদ (সাঃ)-এর কথা কথা বলে, ইসলাম সবাগ্রে নারী অধিকার ও সামাজিক যে সুবিচার এনেছে; তাও জোর দিয়ে বলতে পারেন। সুতরাং তাঁর ধার্মিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রগ্রেসিভ হওয়ায় কোন বাধা-সৃষ্টি হয় নি।

আজ আমার এত কথা মনে হলো এই জন্যে যে, ওদিন আমাকে একজন বললেন, আমাদের দেশে কিছু কবি-সাহিত্যিক এমন পরিবার থেকে আসছেন যাঁদের ইসলামিক ঐতিহ্য রয়েছে; অথচ তাঁরা কখনো মুসলমানদের কোন উপলক্ষে কোন বক্তৃতা দেন না, তা শুধু এ জন্যে—যদি অন্যে মনে করেন তারা প্রগ্রেসিভ নন! সুতরাং খোদা হাফিয বলতে গিয়ে ধন্যবাদ বলেন।

কথাটা সত্যি হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ আমরা এমন অকর্মণ্য জাত হয়ে পড়েছি, কাজ কিংবা চিন্তা করে যে প্রগ্রেসিভ হবো সে সামর্থ্য কিংবা সদিচ্ছা আমাদের নেই! লিখে যদি অতি সহজে প্রগ্রেসিভ দলভুক্ত হ'তে পারি তা হলে মন্দ কি? আমি এঁদের প্রায় সবাইকে চিনি। এঁরা যে আসলে মন্দ তা নয়, কিন্তু যে রাস্তায় সহজে নাম আসে সেটাই খোঁজেন এই মাত্র। নইলে দেখবেন যাঁরা লিখছেন না, তাঁদের মধ্যে এমন

অন্য ধরনের প্রগ্রেসিভও রয়েছেন, যে তাঁরা আধুনিকতায় তাক লাগিয়ে এঁদের অন্নপ্রাশনের ভাত পর্যন্ত বের করে আনতে পারেন।

মোটের উপর কথা হচ্ছে, বিশ্বে অন্যেরা ধর্মে এমনকি তার মধ্যে বিশ্বাস করা কঠিন্ এমন ব্যাপারেও বিশ্বাস রেখে যদি এগিয়ে যেতে পারেন, তা হলে আমাদের দেশে প্রগ্রেসিভ হ'তে গিয়ে ধর্ম-চিন্তা ত্যাগের কথা বলা একটা হীনমন্যতার কমপ্লেক্স ছাড়া কিছুই না।

দৈনিক আজাদ
১৭. ৭. ৭৭

ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয় এই জন্যে যে, মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে এটা ওতপ্রোত হয়ে মিশে থাকে। অন্য ধর্মের মত, ধর্ম ও জীবনযাত্রাকে ইসলাম পৃথক করে দেখে না, এবং জীবনযাত্রার সব কাজ ইসলাম ইবাদত মনে করে।

সেইজন্যে আপনার সব কাজ, আপনি যদি সত্যিকার মুসলিম হন, ইবাদত বলে ধরবেন, কারণ আপনার জীবনযাত্রাকে সুগম করার জন্যে আপনি যা কিছু ন্যায়সঙ্গত করেন সেটাই আপনার কাছে ধর্মীয় হবে। আপনি যদি খাঁটি মুসলমান হন, তা হলে আপনার ইবাদত—নামায, রোযা, হজ্, যাকাতেই শেষ হবে না, রোজ যে কাজ করবেন তার মধ্যেও তা প্রকাশিত হবে। এবং এই কাজকে যদি আপনি ইবাদত বলে ধরেন তা হ'লে দেখবেন আপনার মানসিক প্রবৃত্তিই শুধু নয়, চিন্তাধারাও এমন এক পদ্ধতিতে চলবে যেটা সামগ্রিকভাবে সবার কাজে আসবে। কারণ ঐ কাজ, আপনি যদি সেটাকে ইবাদত বলে না ধরতেন তবে অন্য রকমে করতেন, যেটা আপনার মনে কোন তাসাল্লী আনতো না।

ধরুন, এই যে আমি লিখি; এটা আমি সত্যিকার ইবাদত বলেই ধরি। সুতরাং এটাকে কিভাবে আপনাদের মনঃপূত করে লিখতে পারি সেটা আমার মনে সব সময়ে ওতপ্রোতভাবে থাকে। এবং মানসিকভাবেই হোক, কিংবা নোট করেই হোক কোন ভালো কথা মনে পড়লে তা মনে করে, কিংবা লিখে, রাখি। এমনও বহু হয়েছে, মনে কিছুই আসছে না অথচ পরের দিন লিখতে হ'বে। রাত্রিতে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে শুয়েছি, শান্তি নিয়ে। সকালে উঠে লিখতে গিয়ে দেখি বেশ লেখা আসছে। কেন আসছে ?

আপনারা যাঁরা রীতিমত লেখেন তাঁরা দেখবেন, লেখা দেয়ার সময় আসছে, অথচ লেখার ধারাটা আপনার মনে আসছে না; তখন আপনার লেখার পরম্ শত্রু হ'বে আপনার মনের অস্বস্তি। এবং এই অস্বস্তিটা কাটিয়ে যদি আপনি কলম ধরেন তা'হলে দেখবেন আল্লাহ্ আপনার উপর সদয় রয়েছেন। তবে ঐ যে প্রথমে বলেছি, আপনাকে এর জন্যে তৈরী রাখতে হ'বে। অর্থাৎ যে ধরনের জ্ঞান আপনার লেখার স্বচ্ছলতার জন্যে প্রয়োজন, সেটা আহরণ করে রাখতে হ'বে আগে থেকেই। এটাই হলো আসল ইবাদতের শামিল। ধরুন একজন হাল্কা-ভাবে পড়ে মাল-মসলা সংগ্রহ করে কিছু লিখলেন, আর একজন খুব গভীরভাবে পড়াশুনা করে ঐ একই জিনিস লিখলেন, এবং তাঁর লেখাটা হাল্কাভাবে পড়ার উপর ভিত্তি করা সত্ত্বেও ভালো হলো। তা' হ'লে যিনি বেশী পড়লেন তাঁর অধিক পড়ার ইবাদতের দাম কি পেলেন না? তা কি বৃথা গেল? মোটেই গেল না। ধরুন ঐ দুটো লোকেরই হঠাৎ অন্য একটি বিষয়ের উপর লিখতে হলো, যিনি হাল্কাভাবে আগের লেখাটার জন্যে পড়েছিলেন, তিনি দেখলেন তাঁর জ্ঞানে কুলাচ্ছে না। যিনি গভীরভাবে পড়েছিলেন তিনি দেখলেন তাঁর সেই জ্ঞান আরও চমৎ-কারভাবে এখানেও কাজে আসছে। এবং দেখা গেল তাঁর লেখাটা এত চমৎকার হয়েছে যে, ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি'র লেখাটা তার কাছে নস্যি হয়ে গেল। এ ধরনের হ'তে পার যদি মানেন, এবং আপনার মানতেই হ'বে, যদি আপনার রীতিমত কিংবা রুটিনমাফিক কিছু লিখতে হয়, তা হ'লে আপনার বুঝতে অসুবিধা হ'বে না যে, আপনার লেখার লাইনে আপনার পড়াটা এত কাজে এসেছে, কারণ এটা কোন না কোন সময়ে কার্যকরী হ'বে বলে এ বিষয়ে আপনি বহু পড়াশুনা করে রেখেছিলেন এখন এক্ষেত্রে একজন মুসলমান ও অন্যের সঙ্গে এইটুকু পার্থক্য হ'বে যে, মুসলমান এটাকে অধিকন্তু ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করবেন, যেমন আমি করি, এবং তার জন্যে তিনি একটা পারমার্থিক শান্তিও পাবেন। শুধু তাই নয়, তাঁর পড়ার মধ্যে এবং পড়ে যার মধ্যে কোন ফাঁক থাকবে না। অর্থাৎ তিনি যেটা পড়বেন সেটা সম্পূর্ণভাবে বুঝে পড়বেন কারণ তার সেই না বুঝে পড়ার মধ্যে যদি কোন ফাঁক থাকে তা হ'লে তা অজান্তে তাঁর পাঠকদেরও তিনি পরিবেশিত করবেন বলে তাঁর ভয় থাকবে। এবং এই ভয় থাকাটা মুলত তাঁর কাছে ধর্মীয়

ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হ'বে। তার নিজের বিবেকের কিংবা বুদ্ধির বাইরে তিনি কিছু লিখবেন না, যদি না সেটাও ন্যায়সম্মত হয়।

আমি অন্যদিকে যাব না। এবং এই জন্যে যাব না যে, আমি যখন রীতিমত লিখি, তখন এই লেখার মধ্যেই অন্তত ইসলামের যে দুটি কর্তব্য, যত হাল্কাভাবেই হোক, ইবাদত হিসেবে আমি গ্রহণ করি ; তার মধ্যে প্রথমটি হলো প্রস্তুতি। ইসলামে যে রয়েছে—"নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত না করে কোন দায়িত্ব নেবে না," সেটা। এবং দ্বিতীয়টি হলো সবর। এ দুটোর জন্যে বার বার তাগিদ এসেছে। এ দুটোর মধ্যে সবরই আসল।

শুধু প্রস্তুতি ঠিকমত ফল না দিতেও পারে। এই লেখার ব্যাপারেই সেটা দেখুন। আপনারা যাঁরা লেখেন তাঁরা দেখে থাকবেন ; প্রস্তুতিটা অনেক সময় লেখাটাকে নষ্ট করতে চায়। কথাটা পরস্পর-বিরোধী মনে হ'লেও কিন্তু সত্য।

আপনি লেখার জন্যে নিজেকে কোন রকম প্রস্তুত না করেই যদি লেখেন, তা' হলে ইবাদত দূরে থাকুক তাকে আমি অন্যায়ই মনে করবো। কিন্তু যেখানে আপনি লেখার সব মাল-মসলা যোগাড় করেছেন, অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছেন, সেখানে যদি আপনার লেখার সময় সবর' না থাকে তা হ'লে লেখাটা আপনার নিজের কাছে ইবাদতের পর্যায়ে নাও পড়তে পারে। কি করে দেখুন—

আমরা যখন কোন লেখার জন্যে উপকরণ সংগ্রহ করি, হোক না সেটা কল্পনার কিংবা তথ্যের, তা' যদি এত বেশী প্রচুর হয় যে দিশেহারা হওয়ার অবস্থা ; তখন বড় ধৈর্য সহকারে লেখাটা শুধু যে আরম্ভ করতে হয় তাই নয়, সেটাকে চালিয়েও নিয়ে যেতে হয় ধৈর্যের সাথে, কারণ যেখানে বড় বেশী বলার থাকে, কিন্তু বলার পরিসর থাকে অল্প। সেখানে আগে চিন্তা করে ছক কেটে সেই ছকে লেখাটা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। মনে হয় অনেক ভালো ভালো কথা, অনেক সুন্দর সুন্দর চিন্তাধারা বাদ পড়ে যাচ্ছে। তখন অধৈর্য হয়ে ভালো কিছু তার মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার প্রেরণা এত বেশী অনুভূত হয় যে, নিজেকে রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু আপনি দিয়েছেন কি খতম। আপনার নিজস্ব ধৈর্যচ্যুতির জন্যে আপনি আপনার অজস্র পাঠকদেরকে

আপনার কাছ থেকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবেন। মনে হবে আপনার স্টকের মাল খালাস করছেন। সুতরাং লেখাটাকে আপনার নিজের কাছে ইবাদত বলে মনে করতে হ'লে তার সঙ্গে সবর থাকা দরকার হবে। এ ক্ষেত্রেও আমি মনে করি, 'ফালতু খরচকারী শয়তানের ভাই।' এই যে ভাল ভাল উপকরণ যেটা খরচের কোন মওকা ছিল না সেটা যে খরচ করলেন, তা' ঐ ফালতু খরচেরই শামিল। আপনি যদি সেগুলো রেখে দিতেন, তা' হলে অন্য একটা লেখায় অত্যন্ত ন্যায্য ও সুষ্ঠুভাবে তা' প্রয়োগ করতে পারতেন।

আমার নিজের এমনি একটি জমানো ভাণ্ডার রয়েছে; অর্থাৎ একটা রচনা লেখার সময় যে সব ভালো কথা মনে আসে সে-সব লিখে রেখে দিই একটা নোট বইয়ে, মধ্যে মধ্যে উল্টে পাল্টে দেখি কোন ক্ষেত্রে তা' প্রয়োগ করা যায়। হয়তো এমন হয় যে তা' প্রয়োগ করার সুবিধেই হলো না। কিন্তু তার জন্যে আপসোস করে লাভ নেই। একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। আমার একটা নাটকে অবান্তর হ'বে বলে নিম্নলিখিত সংলাপ কেটে রেখে দিয়েছিলাম, কিন্তু তা' ব্যবহারের আর মওকা হয় নি; আর আল্লাহ্ না করুন কখনো হোক। এবার সেটা দেখুন ঃ

"এনায়েত ঃ কয়েক বছর বি. এ. ফেল করলেও এবার প্রথম বিভাগে পাস করেছি।

বিলকিস ঃ তা' হ'লে তো নকল করে পাস করেছ।

এনায়েত ঃ না আমি অত বেঈমান নই। মোটেই নকল করিনি।

বিলকিস ঃ তবে কি করে প্রথম বিভাগে পাস করলে?

এনায়েত ঃ আমি পাস করিনি, আমার খাতা পাস করেছে। লোক ছিল, তারাই লিখেছে। তারাই সাবমিট করেছে। ছি, ছি, আমি ঘৃণায় ওতে হাতও দিই নি।"

এই সংলাপটা আমি অতি দুঃখে সেই নকলবাজীর দিনের পরিস্থিতির মধ্যে লিখে রেখেছিলাম। ইচ্ছে ছিল, ব্যবহার করবো। তখনকার ছোট একটি নাটিকার মধ্যে এটা ব্যবহার করার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ছকে এলো না বলে ব্যবহার করিনি। যাক, ব্যবহার করিনি ঠিকই করেছি। আল্লাহ্ যে সে পরিস্থিতির পরিবর্তন করেছেন তাতে আমি

তাঁর দরগায় ঠিক তেমনি শোকর গোযারী করি, যেমনি করছি আজকের এই লেখাটায় ওটা উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহারের মওকা সৃষ্টি করে দিয়েছেন বলে।

এবার আশা করি বুঝতে পেরেছেন, যদি মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজ ইবাদত হয়, তা হ'লে লেখাটাও সেভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এবং গ্রহণ করলে লেখকের লেখাটাকে ভাল করার দায়িত্বও বেড়ে যায়। কিন্তু দুটো জিনিস মনে রাখতে হবেঃ প্রস্তুতি যেমন থাকবে লেখাটাকে সমৃদ্ধ করার, তেমনি সবরও থাকবে লেখাটাকে সংযত করে সুষ্ঠু করার। এবং এটা আপনি সত্যিকার মুসলমান হলে ইবাদত হিসেবেই করতে পারেন।

শুধু লেখাই নয়, জীবনের যে কোন কাজ যদি আপনি ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করেন, এবং তার জন্যে প্রস্তুতি ও সবর থাকে, তাহলে দেখবেন সেটা শুধু সহজে হবে তাই নয়। সুন্দর, সুষ্ঠু এবং অন্যের জন্যে কল্যাণকর হবে।

দৈনিক আজাদ
১০. ৭. ৭৭

আমাদের মধ্যে কিছু কিছু লোকের এমন একটি অভ্যাস রয়েছে যে, সরকার যাই করুন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ একটা খাড়া করা চাই-ই। সরকার যে সব জিনিস ভালো করেন তা'ও যেমন ঠিক নয়, যে সব জিনিস খারাপ করেন, তা'ও তেমনি ঠিক নয়। এ কথাটা অবশ্য সব চেয়ে বেশী খাঁটি দেখেছি, রোযা ও ঈদের চাঁদ দেখার সম্বন্ধে। এবং এই কথা নওগাঁ গিয়ে এবারের রমযানের চাঁদ দেখা সম্বন্ধে যে কাণ্ডটা ঘটলো দেখলাম, তাতেই মনে পড়লো।

বুঝলাম চাঁদ দেখা সম্বন্ধে সরকারী ঘোষণা দ্বারা সিদ্ধান্তের যে দোষ ছিল পাক আমলে, বর্তমানে সেটা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকলেও আমরা কিন্তু সেই আমলের মনোবৃত্তি দিয়ে এটা পর্যালোচনা করি। পাক আমলে সরকারীভাবে চাঁদ দেখার ঘোষণায় যে সব অসুবিধের সৃষ্টি হতো সেই সব অসুবিধের বেশীর ভাগ ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের, আবার সব সুবিধের বেশীর ভাগ ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানের। সেই জন্যে এ নিয়ে হৈ চৈ যতটা পূর্ব-পাকিস্তানে হতো, তার চেয়ে কম হতো পশ্চিম-পাকিস্তানে। তবে মওকা মতো দু'দিকেই হতো।

যারা চন্দ্রের কলা বিকাশ বা Phases of the moon সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাঁরা এ সম্বন্ধে সহজে বুঝতে পারবেন, যারা ওয়াকিব-হাল নন, তাঁরা আমি যে কথাটা বলছি সেটা সত্য বলে গ্রহণ করলেই চলবে। আমাদের এখান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানের সময় তখনকার চাঁদ দেখার হিসেবে এক ঘন্টা তফাত্ ছিল, এটা ছিল এই জন্যে যে, সূর্য আমাদের এখানে উদিত হওয়ার এক ঘন্টা পর সেখানে উদিত হতো এবং চাঁদের বেলাও তা' ঘটার কথা। অর্থাৎ আমাদের এখানে নতুন চাঁদ যে সময় দেখার কথা পশ্চিম পাকিস্তানে তা' একঘন্টা পরে দেখা যেত। এবং আমরা জানি

কোন কোন সময় একঘণ্টার মত যদি চাঁদ দ্বিতীয়া পেয়ে যায় তা'হলে সেটা আকাশে দেখা যেতে পারে। অর্থাৎ আমাদের এখানে চাঁদের একঘণ্টা আগে দেখা পাওয়ার মত অবস্থা না হলেও এক ঘণ্টা পরে পশ্চিম-পাকিস্তানে দেখা পাওয়ার মত অবস্থা হতে পারতো। সুতরাং এমন হওয়া বিচিত্র ছিল না, যে আমাদের এখানে যে চাঁদ আদৌ উঠলো না, সে চাঁদ পশ্চিম-পাকিস্তানে দেখা পাওয়ার সংবাদ পেয়ে আমরা রোযা রাখছি এবং ঈদও করছে। রোযা রাখার আমাদের কোন অসুবিধে ছিল না কিন্তু ঈদের অসুবিধে ছিল। রোযা রাখার অসুবিধে ছিল না, এই জন্যে যে, যদি চাঁদ আমাদের এখানে আদৌ না উঠে থাকতো, এবং আমরা পশ্চিম-পাকিস্তানে চাঁদ ওঠার সংবাদ পেয়ে রোযা রাখতাম; তা'হলে পরের দিন সত্যিকার ভাবে আমাদের এ খানে চাঁদ উঠলে বড় জোর আমরা রোযা মুখে সেটা দেখতাম তাতে একদিনের কষ্ট হতো বটে তবে একটি নফল রোযার সওয়াব পাওয়া যেত। কিন্তু ঈদের বেলায় তা' খাটতো না। কারণ যদি ঈদের চাঁদ সত্যিই আমাদের এখানে না উঠতো, এবং আমরা পশ্চিম-পাকিস্তানে চাঁদ উঠার সংবাদ পেয়ে ঈদ করতাম তা'হলে, আমাদের সত্যিকার ফরয রোযা যা হতো তা হতো হয়তো আটাশ কিংবা উনত্রিশটি। এবং সেটাকে সত্যিকার চাঁদ না ওঠার জন্যে যে অতিরিক্ত রোযাটা আগে করা হতো তা' দিয়ে উনত্রিশ কিংবা ত্রিশ করা হতো। অর্থাৎ তাতে এমনও হতে পারতো যে, একটি নফল রোযার মাধ্যমে আমরা আল্লাহ্‌কে পুরো রোযার বুঝ দিতাম।

পশ্চিম-পাকিস্তানেও এমনি পাল্টা অসুবিধে ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানে চাঁদ ওঠার সংবাদ পেয়ে তাদের রোযা রাখতে হলে, এমন হওয়াও বিচিত্র ছিল না যে, তাদের নিজেদের ওখানে চাঁদ দেখে যেদিন ঈদ করতে হতো, সেদিন শেষ রোযা থাকতে হলো। আবার পশ্চিম-পাকিস্তানের চাঁদ দেখার সংবাদ পেয়ে আমাদের রোযা রাখতে হলে, এমনও হওয়া বিচিত্র ছিল না যে, শেষ রোযার দিনে ঈদ করতে হলো। উভয়ই ধর্মমতে হারাম। তবে এই ধরনের অবস্থা সৃষ্টির অবকাশ অবশ্য খুব কম ছিল। কারণ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একই সঙ্গে উভয় অংশে চাঁদ দেখার অবকাশই ছিল বেশী। সুতরাং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন অসুবিধে সৃষ্টি হওয়ার কথা ছিল না। তবুও হতো এবং

সবার অজান্তে এই অসুবিধে হতো; এতো হলো রোযাদারদের পক্ষের কথা।

কিন্তু রোযদার-ভোজদার সবার জন্যে সমান অসুবিধের ব্যাপার যেটা কখনও কখনও ঘটতো, তা' হলো গভীর রাত্রে পশ্চিম-পাকিস্তানে চাঁদ দেখে পরের দিন ঈদ হওয়ার সংবাদ। তখন ঘুম থেকে উঠে দৌড়ঝাঁপ লেগে যেতো।

একবার আমার মনে আছে; শুয়ে পড়েছি ক্লান্ত হয়ে, এমন সময় সংবাদ এলো পশ্চিম-পাকিস্তানে এবোটাবাদে চাঁদ দেখা গেছে, কাল ঈদ। রাত এগারটায় ছুটলাম বাজারে গোশ্‌ত কেনার জন্যে। ধড়াধড় সব যবেহ হচ্ছে, কেনা-কাটা হচ্ছে, ইচ্ছেমত দাম হাঁকাচ্ছে ও তা' আদায় করে নিচ্ছে; এমনি একটা বিরক্তিজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করলাম বারটা-একটা পর্যন্ত। দৌড়া-দৌড়ি করে যখন শুতে গেলাম তখন মনটা বিরক্ত হয়ে উঠলো।

অবশ্য যদি দু'টি প্রদেশে সময়ের হিসেব এক ঘন্টা তফাত হয়, তা'হলেই শুধু এই ধরনের তফাত হতে পারে কখনও কখনও। অর্থাৎ পূর্বে থেকে চাঁদ এক ঘন্টা পরে পশ্চিমে সত্যিকারভাবে উদিত হতে পারে। তবে যেখানে খাড়া উত্তর কিংবা খাড়া দক্ষিণে দু'টো প্রদেশ কিংবা দেশ থাকে সেখানের সূর্যের মত চাঁদও এক সঙ্গে উঠবে; এবং যেখানেই সে চাঁদ দেখা যাক না কেন, সমগ্রদেশে সেটা সত্যিকার-ভাবেই দেখার শামিল হবে। সুতরাং আমাদের যদি পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান না হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ-পাকিস্তান হতো, তা হলে দেশের যেখানেই চাঁদ উঠুক না কেন, তার সংবাদ সমগ্র দেশের জন্যে সত্যিকার-ভাবে দেখার সংবাদ হতো। অতএব উপরে উল্লেখিত ধর্মীয় অনুশাসনের কোন ব্যত্যয় কখনো ঘটতে পারতো না।

সে যা হোক, পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের এই দুটো অংশে সময়ের এক ঘন্টা তফাত ছিল। এবং তার জন্যে সৃষ্ট যে সব অসুবিধে দেখালাম তা' সৃষ্টি হয়েছিল। এবং সেই জন্যেই তখনকার দিনে 'রুয়েতে হেলাল' কমিটির প্রতি প্রায় লোকের গভীর বিতৃষ্ণার ভাব ছিল। এবং সেটা যে অনেকটা ন্যায়ত ছিল তা' বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু বর্তমানে সে অবস্থা একেবারেই নেই। এখন বাংলাদেশে যদি কোনখানে

চাঁদ দেখা যায়, তা' হলে ধরতেই হবে, বাংলাদেশে চাঁদ উঠেছেই। অবশ্য যিনি দেখেছেন তাঁর দেখাটার সাক্ষ্য মসয়ালা অনুসারে বিচার করে গ্রহণ করতে হবে। এবং এই মসয়ালা হলো—মেঘলা আকাশে মাত্র একজন বিশ্বাসী পরহেযগার লোকের চাঁদ দেখার সাক্ষ্যই যথেষ্ট ; পরিষ্কার আকাশে কিন্তু দরকার পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্য। এ হলো রমযানের চাঁদ দেখার ব্যাপারে। অবশ্য বে-নামাযী, শরাবখোর ও মিথ্যাবাদীর সাক্ষ্য তা তিন বা ততোধিক হলেও চলবে না। কিন্তু ঈদের চাঁদের ব্যাপারে আবার শুধুমাত্র একজন পরহেযগারের সাক্ষ্য চলবে না। অন্তত দুইজন পরহেযগার পুরুষের কিংবা একজন পরহেযগার পুরুষ ও দুইজন পরহেযগার স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য চাই। শুধুমাত্র স্ত্রীলোকের সাক্ষ্যও আবার অচল। আর একটা কথা হলো, যে চাঁদ উঠবে তার আগের মাস যদি ত্রিশ দিনের হয়ে থাকে তা' হলে ধরতেই হবে নতুন চাঁদ উঠেছে, কারণ আরবী মাস কখনো ত্রিশ দিনের বেশী হয় না।

এই হলো মোটামুটি চাঁদ দেখার ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ। এবং এই প্রমাণ পাওয়া গেলেই চাঁদ উঠেছে বলে ধর্মমতে ধরা হবে। এবং বাংলাদেশে তা' যদি কেউ না ধরেন তা'হলে তিনি যে শুধু অহেতুক বিভেদ সৃষ্টি করবেন তাই নয়, রোযার ব্যাপারে বিপর্যয়ও ঘটাবেন। কারণ তাঁর রোযা একদিন কম হতে বাধ্য হবে ; এবং তার জন্যে কোন কৈফিয়ত থাকবে না। আর শুধু তাই নয়, তিনি যদি অন্যকে তাঁর মতে টানেন তবে তার জন্যেও তিনি দায়ী হবেন।

নওগাঁ গিয়ে চাঁদ দেখার সম্বন্ধে যে কাণ্ডের কথা উল্লেখ করে এত কথা বললাম সেটা হলো এই ঃ

এবার ৫ই আগস্ট আমি সেখানে ছিলাম। সরকারীভাবে শবে-বরাতের চাঁদ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ই আগস্ট থেকে রোযা হওয়ার কথা। সুতরাং ৫ই তারিখে ইশার ওয়াক্তে গেলাম নওগাঁ আধুনিক হাসপা-তালের কাছের একমাত্র যে বড় মসজিদ রয়েছে সেখানে নামায পড়তে। চাঁদের খবর নেই ; মনে করলাম খবর পাওয়া গেলে যে খতম তারাবীহ হবে, সেখানে সেটা যেন না হারাই। জামায়াত আরম্ভ হওয়ার দশ-মিনিট আগে মুসল্লীরা এসে বললেন যে, রেডিওতে খবর দিয়েছে, ঢাকা

ও মোমেনশাহীতে চাঁদ দেখা গেছে। কিন্তু ইমাম সাহেব বললেন, নিজে চাঁদ না দেখে রোযা রাখবেন না। যাক, জামায়াত শুরু হলো, তিনিই ইমামতি করলেন। ফরয ও সুন্নত পড়ার পর তারাবীহ শুরু হলো এবং নব-নিযুক্ত হাফেয সাহেব তারাবীহ পড়ালেন। তারাবীহ্ শেষে যখন বিতরের নামাযে ইমামতি করার জন্যে ইমাম সাহেবের ডাক পড়লো, তখন দেখা গেল তিনি নেই। শুনলাম তিনি নাকি তারাবীহ না পড়েই চলে গিয়েছেন। রাস্তায় ফিরে আসার সময় একজন বললো ; রেডিওর সংবাদ না মেনে তারা গতবার নওগাঁতে আটাশটি রোযা রেখেছে।

জানি না, ইমাম সাহেব ৬ তারিখেই রোযা রেখেছেন কি-না। যদি না রেখে থাকেন তবে আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করি, এবার যেন উনত্রিশটি রোযা হয়। দেখি তিনি আল্লাহ্‌কে কি করে বুঝ দেন। সত্যিই যদি তা হয় তা হলে তার খোঁজ করে আপনাদেরকে সে বৃত্তান্ত পরে জানাবো।

দৈনিক আজাদ
১৩. ৮. ৭৭

ইসলামের ধর্মীয় অনুষ্ঠান গতানুগতিকভাবে পালন, এবং তার মধ্যে দৈনন্দিন মানব জীবন সুষ্ঠুভাবে পালনের যে সর্বাত্মক নীতি রয়েছে সেটা অনুধাবন করে এই দুই পালন-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে, তা' সেই ব্যক্তি সহজে বুঝতে পারবেন না, যিনি সজাগভাবে এটা উপলব্ধি করেন না।

এই উপলব্ধির তারতম্য প্রত্যেকের একেবারে নিজস্ব অনুভূতির ব্যাপার। একটি কথা বলে জিনিসটা বোঝাবার চেষ্টা করে, আমি আসল কথা, আমার নিজের জীবনে যে রকম অনুভব করেছি, সেইভাবে বলবো। প্রথমে যে কথা বলতে চাইছি সেটা হলো এই, আজ আমাদের গুলশান মসজিদের ইমাম মওলানা আবদুস সালাম সাহেব তারাবীহ নামাযের শেষে বলছিলেন, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ তায়ালার নিকট আরয করলেন, তাঁকে এমন একটা কথা বলতে, যা' তিনি এবং আল্লাহ্ ব্যতীত কেউ জানেন না। তখন আল্লাহ্ যা বললেন সেটা হলো, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" । হযরত মূসা (আঃ) বললেন, ইয়া "আল্লাহ্, এ তো সকলেই জানে।" তখন আল্লাহ্ বললেন, "এর মরতবা ব্যক্তিগতভাবে এত বৃদ্ধি করা যায়, যে তার কাছে তার জীবনটাই এতে আল্লাহ্ময় হয়ে পড়ে, আল্লাহ্‌র একত্ব ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পায় না। সুতরাং এই জ্ঞানটা তার কাছে সকলের চাইতে পৃথক হয়ে পড়ে।"

পরন্তু ইসলামের ধর্মীয় যে কোন অনুষ্ঠান গতানুগতিকভাবে সেটা পালনে সবার জন্যে এক হ'লেও প্রত্যেকে দৈনন্দিন জীবনে তার নিজস্ব অনুভূতি দিয়ে সেটা চর্চা করার মধ্যে এমন জিনিস আনতে পারে, এক মনে হলেও আসলে সেটা অন্যদের তুলনায় সত্যিকারভাবে অনেক তফাত হয়ে যায়। এটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় যেরূপ অনুভব করি সেইভাবেই কথাটা বলছি।

ধরুন এই রোযা, এই সিয়ামের কথা। আমরা যারা রোযা রাখি কিংবা না রাখি তারাও সিয়ামের মোটামাটি অর্থ জানি। এবং যারা রাখি তারা মনে করি সেই অর্থেই আমরা রোযা রেখে সিয়াম পালন করছি। নিজেকে সংশোধন করা, নিয়ন্ত্রণ করা, পাপ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচান, অন্যের গীবত না গাওয়া, গরীব-দুঃখীদের অনশনের দুঃখ বুঝা, এইসব নিজেদের মধ্যে হাসিল করা যা' রোযার উদ্দেশ্য, আমরা তা করছি।

কিন্তু এই রোযা যদি সিয়াম হিসেবে আমরা মনেপ্রাণে ধরি, তা' হ'লে মনের মধ্যে তার সত্যিকার তাৎপর্য অনুভব করে আমাদের মনকে সেভাবে আমরা ক'জন পরিচালিত করছি সেটাই হলো প্রশ্ন। আমরা যে রোযা রাখছি, নামায পড়ছি, তারাবীহ্ পড়ছি, দোয়া-দরূদ পড়ছি বলে মনে করছি, আমাদের সিয়াম পালন হচ্ছে; কিন্তু প্রশ্ন, তা-কি হচ্ছে? রোযার মধ্যে জিনিসের দাম বেড়েছে। ধরতে গেলে এমন বহু ব্যবসায়ী নিঃসন্দেহে রোযা রাখছেন, যাদের এই ধরনের দাম বাড়ানোর মধ্যে অবদান রয়েছে। এমন বহু লোক রয়েছেন যারা এই রোযার দিনেই বরং বেশী চটাচটি করছেন। যাকে আমরা বলি রোযা লেগেছে; সেই ধরনের কাজ করছেন, এমনকি রোযাদার পরহেযগার লোকও যাকে পছন্দ করেন না, তার সম্বন্ধে এমন মত প্রকাশ করছেন, যা' চোগলখুরী না হ'লেও সত্যিকারভাবে দেখতে গেলে সিয়ামের পরিপন্থী হচ্ছে।

এবার এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বেশ পরীক্ষা করে দেখেছি, আমাদের চরিত্রে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন যত সহজ হয়, তার তাৎপর্য অনুভব করে সেটা পালন করা তত সহজ নয়। তার এক প্রধান কারণ আমাদের চরিত্রটা সাধারণভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যে স্তরে এবং বিভিন্নভাবে যাদের মধ্যেই বিচার করুন না কেন, দেখা যাবে যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে চরিত্রের এমন ব্যত্যয় ঘটছে যা আমাদের তাৎপর্যহীনভাবে ধর্মানুষ্ঠান পালন দ্বারা মোটেই শোধিত হচ্ছে না।

এবার এই রমযানের মধ্যে, অনুষ্ঠান ধরলে, আমরা সবাই মোটা-মুটিভাবে সিয়াম পালন করে যাচ্ছি। কিন্তু আসলে সিয়ামের তাৎপর্য অনুভব করছি কি?

কিভাবে এই অনুভূতির কথা আমি চিন্তা করি সে কথা বলতে গেলে আমার নিজস্ব অনুভূতির কথা বলাই ঠিক। যদি আমি সেটা ভালো শোনাবে না বলে তা' না বলি, তা'হ'লে এই রোযার দিনে এই কলম ধরে তা' না লিখে যে ব্যত্যয় ঘটাবো, সেটা সিয়ামের ব্যত্যয় হ'বে। আমার কথাগুলি হয়তো অপ্রিয় সত্য হ'বে, তবুও সিয়াম সাধনার উপমার জন্যে সেটা বলা কর্তব্য।

অপ্রিয় সত্য সাধারণত বলতে গেলে দুটি শ্রেণীতে পড়ে ; এক হলো, নিজের সম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে ভালো কথা, যেটা সত্য সেটা বলা। দুই হলো, অন্যের সম্বন্ধে নির্ভয়ে সত্য যেটা খারাপ, সেটা বলা এবং এই দুটোর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে যেটা বলা সেটা অন্যে বিশ্বাস করে কম। অন্যের সম্বন্ধে যেটা বলা সেটা অন্যে বিশ্বাস করে বেশী।

রোযা আমি রাখি, নামায পড়ি এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক কিতাব-কালামও পড়ি। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে রমযানে সবাই যে রকম ধর্ম পালন করছে তা' করি।

কিন্তু তবুও তা' তাৎপর্যের চিন্তাধারায় তফাত হয় ; যেমন আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, আমার লেখায় একই জিনিস অন্যের চিন্তাধারার চাইতে যেমন তফাত হয়, এও ঠিক তেমনি।

রমযানের এই সিয়াম সাধনা আমি একটি রিফ্রেশার্স কোর্স হিসেবে ধরি। অর্থাৎ লোকের শিক্ষাদীক্ষায় মরচে পড়লে ঝালাই করার জন্যে যেমন আবার একটা কোর্স করার বন্দোবস্ত রয়েছে ; তেমনি আমার কাছে রমযানের এই সিয়াম সাধনা মনে হয়, নিজের আত্মাকে একটা মাস ঝালাই করে বাকী এগারটা মাস ঠিকভাবে চলার বন্দোবস্ত করা।

রোযার মধ্যে আমি বেশ সজাগ থাকি। আমাকে যাঁরা ব্যক্তিগত ভাবে জানেন তাঁরা এও জানেন, আমার নিজের সম্বন্ধে এমন অনেক কথা বলি তা' কেমন যেন তাঁদের কাছে মিথ্যা বলে মনে হয়। যদিও আমার জানা মতে আমি মিথ্যা বলি না, তবুও তাঁদের কাছে, তা' মনে হয়। তার কারণ হলো, কথাগুলি অপ্রিয় সত্য। এবং আমি আগেই উল্লেখ করেছি নিজের সম্বন্ধে অপ্রিয় সত্য কি করে বিশ্বাস করা হয়। আমি অন্যকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে এ কথা বলতে পারি, সত্য

গোপন করি অনেক সময়ে ঠিক, কিন্তু মিথ্যে কথা সরাসরি বড় একটা বলি, তা' কেউ বলতে পারেন না।

কিন্তু এই মিথ্যে গোপনই বলুন, কিংবা সরাসরি মিথ্যা না বলার কথাই ধরুন' এটা কিন্তু সিয়ামের ব্যত্যয় হয়। সুতরাং এই রোযার দিনে, ঐ ধরনের কিছু মনে এলে মনকে পরিষ্কার করে ফেলি। ধরুন কোন কলেজে আমার পরিচিত, কিংবা বন্ধুদের কেউ কিছু লিখলেন। লেখাটা সম্পূর্ণ ভালো না লাগলেও মোটামুটি ভালো লেগেছে দেখলাম। কিন্তু সেখানে যদি সরাসরি ভালো লাগে বলি তা' হ'লে সেটা সরাসরি মিথ্যা না বলাই হলো। এ কথা অন্য কোন মাসে আমার মনকে উদ্বেলিত না-করলেও রোযার মাসে কিন্তু আমাকে নাড়া দেয়। তখন সঠিকভাবে আসল কথাটা আমাকে বলতে হয়। তবে তার মনে কি প্রতিক্রিয়া হ'বে সেটাও আমার চিন্তা করতে হয়, কারণ একজনের মনে কষ্ট দেয়া সেটাও সিয়ামের ব্যত্যয়। সুতরাং বেশ সাবধানে কথাগুলো বলতে হয়। সত্য কথা বলা, অন্যের মনে কষ্ট না দিয়ে সাবধানে বলা, এবং সেই সাবধানে বলার তরীকা হাসিল করে নিজের বাকভঙ্গীকে উন্নত করে আল্লাহ্ প্রদত্ত যবানকে উন্নত করা, শুধু মিথ্যা কথা না বলার চেষ্টা থেকে উদ্বুদ্ধ হ'তে পারে যদি আমরা রোযার দিনে সিয়াম ধরে এটা চর্চা করি।

এটা একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে দেখান হলো। আসলে দৈনন্দিন জীবনে এই রোযার দিনে হাজারো এমনি জিনিস পাবেন, যা' সিয়ামের পরিপ্রেক্ষিতে তার তাৎপর্য খুঁজে বের করে যদি আপনি তা করেন, তা'হলে আপনাকে সেটা নতুন করে আলো দেখাবে।

ধরুন, খতম তারাবীহর কথা। দেড় ঘন্টায় প্রায় তেত্রিশ রাকায়াত নামায পড়তে হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এটা করি এবং তাতে সওয়াবও হাসিল হয়, কিন্তু আমি যখন এই তারাবীহ পড়তে যাব মনে করি তখনই মনে হয়, কঠিন কাজ করতে হবে। কিন্তু গিয়ে দাঁড়ালেই মন তৈরী হয়ে যায় এবং নামায যখন শেষ করি তখন যে কষ্ট ও ক্লান্তি— যা' আশঙ্কা করেছিলাম তার কিছুতো থাকেই না; বরং এই সালাত আনন্দদায়ক মনে হয়। এর থেকে আমি সিয়ামের যে সত্য অনুভব করি তা'হলো এই, কোন সৎকাজ আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যদি আমরা

৫—

করার নিয়ত করি, তা' যতই কঠিন হোক না কেন, করা আরম্ভ করলে তার ক্লান্তির কথা মনে থাকে না, এবং শেষ হলে তা' পরম শান্তি দেয়। আবার এ সঙ্গে এও মনে করি যে, এই নামায যদি আমি হাফেযে কুরআন হয়ে একাই পড়তাম তা'হলে তা' অন্যের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ দিত না এবং এতটা সহজ ও আনন্দদায়ক হতো না, যেমন এটা হয় বড় জামায়াতে। সুতরাং এর থেকে আবার এটা আসে যে, আমরা সবাই একসঙ্গে কোন সৎকাজে যদি আত্মনিবেদন করি তা' হ'লে তার থেকে আমরা অধিকতর আনন্দ লাভ করতে পারি।

এইভাবে বলতে গেলে প্রত্যেকটি কাজ ও চিন্তাদ্বারা রোযার দিনে আমরা সিয়াম-সম্মতভাবে গ্রহণ করতে পারি, যার দ্বারা শুধু আনুষ্ঠানিকভাবে নয়; বরং তাৎপর্য অনুভব করে, জীবনের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে, আমরা আমাদের জীবনকে অধিকতর উন্নত করতে পারি। এবং সেটাকে পুনঃ শিক্ষার মাধ্যমে, অর্থাৎ রিফ্রেশার্স কোর্স হিসেবে গ্রহণ করে সারা বছরের জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারি।

দৈনিক আজাদ
৪. ৯. ৭৭

যে কোন অনুষ্ঠান দু'রকম দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে করা যায়। এক হলো আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তব্য করার জন্যে করা, আর দুই হলো এই করার মধ্যেই অনুষ্ঠানের অতিরিক্ত অনুভূতিসাপেক্ষ যত কিছু শুভ রয়েছে, তা' অনুভব করে এই কর্তব্যটা করা।

উভয় ক্ষেত্রেই কর্তব্য করা হয়; কিন্তু এই কর্তব্য করার মধ্যে মানসিক তৃপ্তির খুবই তফাত হয়। এবং সজ্ঞানে যদি আমরা এই মানসিক তৃপ্তির প্রবৃত্তি লাভের খোঁজ করি, তা হলে আমাদের আত্মারও উন্নতি হয়। এবং সেটা ঐ অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, অন্য সকল ক্ষেত্রেও হয়।

ধরুন, আপনি কোন অফিসে দশটা-পাঁচটা কাজ করেন। কর্তব্যপরায়ণতার সঙ্গেই করেন। আপনার কাজ লোকদের পক্ষে যায়, আবার বিপক্ষেও যায়। ন্যায়-অন্যায় যা করেন কর্তব্যের খাতিরে ছক মত তা করেন। এটা হলো আনুষ্ঠানিকভাবে কর্তব্য করা। কিন্তু ধরুন, আপনি এই একই কাজ যখন করছেন তখন আপনার মনকে সজাগ রাখছেন, অন্যায়টা যখন করছেন সহানুভূতি দিয়ে বুঝেই করছেন; আবার ন্যায় যখন করছেন, তখনও আগ্রহের আতিশয্যে তা' করছেন না। এবং এই মনোবৃত্তি নিয়ে কাজ করলে দেখবেন ফল এক হলেও, মানসিক তৃপ্তির তফাত হবেই।

এবং এই অতিরিক্ত তৃপ্তি খুঁজে কাজ করা ও না করার মধ্যে যে তফাত হয় সেই কথাই বোঝানোর জন্যে বলছিলাম যে, আনুষ্ঠানিকভাবেও আমরা যে কাজ করি তা' দু'রকমের দৃষ্টিকোণের মাধ্যমে করতে পারি; ফল এক হলেও দেখার রকমফেরে মানসিক তৃপ্তির তফাত হয়।

এবং আমার মনে হয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এই দৃষ্টিকোণের পার্থক্য মনকে ভিন্নভাবে স্পর্শ করায় পার্থক্যও ঘটায় বেশী। প্রত্যেকটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনে, অতিরিক্ত মানসিক দৃষ্টিকোণ দ্বারা তার উপলব্ধি ও পালন যে করণীয় কার্যের মধ্যেও কতটা তৃপ্তির তারতম্য ঘটাতে পারে তা বহু পূর্বে আমার জুমআর নামায এবং ওয়াক্তিয়া নামাযের কথা বলার সময় একবার বলেছিলাম। আজ তারাবীহ নামাযের সম্বন্ধে বলবো কি করে একই অনুষ্ঠান দৃষ্টিকোণের তারতম্যের জন্যে তৃপ্তির তারতম্য ঘটাতে পারে।

রোযার মাসে চাঁদ দেখার রাত থেকে শওয়ালের চাঁদ দেখা পর্যন্ত একমাসে তারাবীহ্ নামায পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ্। এটা জামায়াতের সঙ্গে কিংবা একা একাও পড়া যায়। রোযাদার ও বে-রোযাদার উভয়ের প্রতি এটা একই রকম সুন্নত। এই হলো তারাবীহ্ সম্বন্ধে মসয়ালা।

এখন দেখুন এর থেকে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরেও মানবিক দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে এটা পালন কি করে তৃপ্তির তারতম্য ঘটাতে পারে। এবং যেহেতু এই দৃষ্টিকোণ মানবিক, সেহেতু তার প্রসূত অনুভূতিও ব্যক্তিবিশেষে বিভিন্ন হতে বাধ্য। সুতরাং আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও অনুভূতি দিয়ে যেটা উপলব্ধি করছি তাই বলবো।

একা একা বাড়ীতে তারাবীহ্‌র নামায পড়লে যে সুন্নত আদায়ের কর্তব্য পালন করা হয়, জামায়াতে পড়লেও সেই সুন্নত আদায় করা হয়। আবার মসজিদে পড়লেও সেই কর্তব্যই পালন হয়ে যায়। সূরা তারাবীহ কিংবা খতম তারাবীহ যেটাই পড়া যাক না কেন, সুন্নতটা সমানভাবে আদায় করা হয়। কিন্তু দৃষ্টির তারতম্যে এর প্রত্যেক ধরনের নামায যিনি পড়েন তাঁর কাছে এর আনন্দেরও তারতম্য ঘটে।

ধরুন, আপনি বাড়ীতে একা সূরা তারাবীহ পড়ছেন। তার একটা বড় সুবিধে হলো এই যে, আপনার যখন ইচ্ছে সেটা পড়তে পারেন। তাড়াহুড়ো নেই। ইফ্‌তারি করে ধীরে-সুস্থে আরাম-আয়েশ করে ইচ্ছে মত পড়ে উঠলেন।

কিন্তু তাতে যে জিনিসটা আপনি হারাচ্ছেন সেটা হলো একটা তাগিদ। নামায আপনাকে ডাকছে, সেই তাগিদ। যদি জামায়াতে আপনি

না পড়েন তা' হলে সবাই মিলে একসঙ্গে সময়মত নামায পড়ার যে একটা তাগিদ সৃষ্টি করে সেটা আপনার থাকে না। এবং যে কোন কর্তব্য কর্মে তাগিদ সৃষ্টি করতে পারলে দেখবেন সেটা আপনাকে ঐ কর্তব্য কাজ করার জন্যে অন্যভাবে যে অনুপ্রাণিত করবে তাতে আপনি ঐকাজ করাতে অধিকতর আনন্দ পাবেন। এই জামায়াত নিজের কিংবা কারো বাড়ীতে হতে পারে এবং মসজিদে তো হয়ই। মসজিদে জামায়াত পড়ায় মহল্লার সকলের সঙ্গে মেলার এবং অধিকতর সঠিক সময়ে নামায পড়ার তাগিদটা অধিকন্তু থাকে বলে, সেটা আরও বেশী তৃপ্তিদায়ক হয়। বাড়ীতে জামায়াতে প্রায় দেখা যায়, ডাকাডাকি করে সকলে একত্রে হয়ে পড়া হয়, সুতরাং নিয়মতান্ত্রিকতা তাতে ততটা থাকে না, যতটা থাকে মসজিদে তারাবীহ্ পড়াতে। মসজিদে তারাবীহ্ পড়াতে আর যে একটা সুবিধে হয়, সেটা হলো যাওয়া ও আসার সময় আলাপ-আলোচনা করে পথ চলা যায়।

সব আলোচনাই প্রায় রোযাসংক্রান্ত হয় বলে সেটা অন্তরঙ্গও হতে বাধ্য। কোথায় সস্তায় কোন ইফতারির জিনিস পাওয়া যায়, এই ধরনের আলোচনা থেকে সেহরী খাওয়া গত রাত্রে কি করে ফস্‌কে যাচ্ছিল এই রকম হাজারো কথা হয়ে নামাযীদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বাড়ে।

আবার খতম তারাবীহ্‌র ব্যাপারে দেখুন, এতে সম্পূর্ণ আলাদা আনন্দ। খতম পড়ার জন্যে মন ধর্মীয়ভাবে খুশীতো হয়ই ; তার উপর আরও খুশী হয় ওটা পড়া যে কত স্বাস্থ্যকর সেটা মনে করে।

খতম তারাবীহ পড়ার আগে মন যেন বেঁকে বসতে চায় ; কারণ প্রায় দেড় ঘন্টা ধরে নামায পড়ার কথায় মন সাধারণতঃ নিরুৎসাহ অনুভব করবেই কিন্তু তারাবীহ যখন শেষ হয়, তখন এই দেড় ঘন্টার নামায শরীরকে এমন হাল্কা ও ঝরঝরে করে দেয় যে মনে হয় রোযার অবসাদ সম্পূর্ণভাবে বিদূরিত হয়ে গেছে। এবং একটা মাস এই নামায পড়ার পর শরীর এমন সুস্থ হয়ে যায় যে পরবর্তী রোযার মাসের খতম তারাবীহ্‌র জন্যে মন উদগ্রীব হয়ে থাকে।

আমি অবশ্য গত দশ বছর যাবত মসজিদ গিয়ে খতম তারাবীহ্ পড়ছি। এবং এই পড়াটা আমার মন ও স্বাস্থ্যকে এমন নিবিড়ভাবে

প্রভাবান্বিত করছে, যে আমি মসজিদে গিয়ে খতম তারাবীহ্ পড়ার বিকল্প কোন তারাবীহ্ পড়ে মনে শান্তি পাব না বলে মনে করি। মসজিদে পড়ার কথা বলছি এই জন্য যে আমার বাসার পাশের বাসায়ও দশ-পনেরজন মিলে খতম তারাবীহ্ পড়েন; সেখানে আমাকে পড়ার জন্যে দাওয়াতও করেছেন। কিন্তু মসজিদে পড়ে পড়ে খতম তারাবীহর যে লজ্জত পেয়েছি তাতে আমার বাসা থেকে গুলশান জামে মসজিদ প্রায় আধা মাইলের উপর হলেও সেখানে গিয়েই নামায পড়ায় যে অতিরিক্ত তৃপ্তি পাই সেটার জন্যেই যেতে হয়।

তাই বলছিলাম দৃষ্টিকোণের পার্থক্যে যে কোন অনুষ্ঠান অপেক্ষাকৃত বেশী আনন্দ দিতে পারে। যারা কোন দিন মসজিদে গিয়ে খতম তারাবীহ পড়েন নি; তাঁরা যদি সাতদিন সেখানে গিয়ে তা' পড়েন তা হলে বুঝতে পারবেন আমার কথা কতদূর সত্য। তাঁদের জন্যেই এটা লিখলাম।

দৈনিক আজাদ
২৩. ৮. ৭৮

আমি রোযা রাখার ব্যাপারে আগের কোন এক সংখ্যায় বলেছিলাম রোযাটাকে যদি ধর্মীয় ব্যাপারের বাইরেও ধরা যায় এবং স্রেফ যদি কোন ব্যক্তি, ধর্ম নিরপেক্ষ অনশন হিসেবেই এটাকে ধরে, সারাদিন না খেয়ে, তার সমপর্যায়ের ও স্তরের অন্য লোকদের মতই কাজ করে যেতে পারে, তাহলে সেটাও তাকে অন্যাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বুনটের লোক বলে এতদূর আত্মতৃপ্তি দিতে পারে যা রোযা না রাখা লোকদের বোঝা অসম্ভব। সুতরাং রোযা না রেখে তারা কি হারাচ্ছে তারা জানে না। আজ নামায সম্বন্ধেও ঐ কথা বলতে চাই, যারা নামায পড়ে না, তারা জানে না যে, তারা কি হারাচ্ছে।

এ ক্ষেত্রেও ধর্মীয় ব্যাপারের বাইরেও যদি নামাযকে ধরেন, তা হলেও দেখতে পাবেন নামায পড়াটা এমন একটা অপরূপ অনুষ্ঠান, যার উপকারিতা যিনি রীতিমত নামায না পড়েন তিনি মোটেই বুঝতে পারবেন না। যেমন আমি আগে পারিনি।

শারীরিক ও মানসিক ব্যাপারে এটা এতটা তৃপ্তিদায়ক এবং সামাজিক ব্যাপারে এতটা আনন্দদায়ক যে গম্ভীর ও ভারী বা হালকাভাবে এটা লিখলে এর আকর্ষণ আরও বেশী মনে হবে। সুতরাং সেইভাবে লিখছি।

অবিচ্ছিন্নভাবে আমি রোযা ছেলেবেলা থেকেই রাখি ; কিন্তু কাযা না করে রীতিমত নামায পড়ছি—আমার মেয়ের বিয়ের এক বছর মাত্র আগে থেকে। মানে বেশ দেরীতে। এবং সেটা আরম্ভ করেছিলাম এক রমযানের প্রথম খতম তারাবিহ দিয়ে। এবং সেই থেকে এমন মজা পেয়ে গেলাম যে, কামাই করার প্রশ্নই উঠলো না। কেন? সে কথা পরে বলবো। কারণ, রীতিমত ওয়াক্তিয়া নামায পড়ার স্বাদ পাই বহু পরে। আগে পাই জুমআর নামায পড়ার স্বাদ। সুতরাং সেই

কথাই আগে বলি। কি করে একটা অপূর্ব সামাজিক সুবিধা ও আনন্দ এর মধ্যে রয়েছে, তা আমি আমার কলেজের দিন থেকে যেমনি বুঝতে পেরেছি অমনি আর ছাড়িনি।

এর প্রকৃষ্ট একটি উদাহরণ দিলেই বুঝবেন। বৃটিশ আমলের কথা। আমি তখন সবেমাত্র কলকাতা হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস শুরু করেছি। সেই সময় বাংলা আইন পরিষদের কোন একটি নির্বাচনে আমার বন্ধু ফজলুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দাঁড়ায়। ডাকের ব্যালট, কলকাতা থেকে ভোটারগণ ভোট পাঠাবেন। জোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে, মাত্র শ'আড়াই ভোট। সুতরাং "এক-একটা ভোটের" মূল্য খুব বেশী।

আমাদের গ্রুপের পাঁচজন 'সিওর' ভোটার ছিলেন তালতলায়। ভোটার লিস্টে প্রদত্ত ঠিকানায় তালতলায় গিয়ে শুনলাম তারা পাঁচজন মাত্র এক সপ্তাহ আগে বাসা বদল করে কলিন্স স্ট্রীটে গিয়েছেন। বাসার নম্বর কিংবা অন্য কোন হদিস তালতলার তারা দিতে পারলেন না। পইপই করে কলিন্স স্ট্রীটে খুঁজেও তাদের কোন পাত্তা পাওয়াই গেল না। সবাই মাথায় হাত দিয়ে বসলো।

পরের দিন শুক্রবার অফিস-আদালত বন্ধ ছিল। আমি তাদেরকে বললাম, "ঘাবড়ায়ো না, ইনশা আল্লাহ্ শনিবার তক আমি তাদের খবর দিতে পারবো" এবং দিলামও। কি করে শুনুন; আমি জানতাম তাদের মধ্যে একজন রীতিমত নামাযী ছিলেন, অন্য একজন মাঝে মধ্যে নামায পড়তেন। সুতরাং মনে করলাম শুক্রবার যখন বন্ধ, তখন কলিন্স স্ট্রীটের বড় মসজিদটায় নামাযী যিনি তিনি নিশ্চয়ই নামায পড়তে আসবেন। সুতরাং সেই মসজিদে আমি নামায পড়তে গেলাম। এবং অন্য ছোট মসজিদটায় অন্য একজনকে পাঠালাম। নামাযের আগেই আমার আকাঙ্ক্ষিত লোকটির সঙ্গে আমার দেখা হলো, এবং নামায শেষে তার সঙ্গে তার বাসায় এসে দেখি অন্য জনের সঙ্গে আমাদের দ্বিতীয় কর্মীটিও এসে পৌঁছেছেন।

জুমআর নামায যে একটা বিরাট সামাজিক মিলন ক্ষেত্রের সৃষ্টি করে এবং তা প্রতি সপ্তাহে একবার করে, এই জ্ঞানের দ্বারা ত্রিশ বছর আগে আমি কি সুবিধা গ্রহণ করেছিলাম শুনুন।

তখন লণ্ডনে এত বাঙালী ছিলেন না। বিশেষ করে যারা আমাদের এখান থেকে পড়তে যেতেন তাদের সংখ্যা তো খুবই কম ছিল। আমি গিয়ে কিছুটা মনমরা মত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি জানতাম প্রতি সপ্তাহে ভিন্ন ভিন্ন মসজিদে জুমআ পড়লে পরিচিত দেশী কারও না কারও সঙ্গে দেখা হবেই। সুতরাং তাই করতে লাগলাম এবং প্রত্যেক জায়গাতেই এক-আধজন লোক পেলাম যার মাধ্যমে ঐ স্থানের অন্যদের খবরও নিতে সক্ষম হলাম। এটাকে পরে আমি আরো ব্যাপকভাবে কাজে লাগাই।

আমার লণ্ডনে অবস্থানের শেষের দিকে আমি যখন তদানীন্তন পাকিস্তান এমব্যাসির এডুকেশন অফিসার ছিলাম, তখন সবার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হওয়ার জন্যে কোন জুমআ পাটনী মসজিদে, কোন জুমআ ইস্ট এণ্ড মসজিদে, কোন জুমআ ইসলামিক কালচার সেন্টারে ও কোন জুমআ এমব্যাসিতে পড়তাম। তার জন্যে আমাদের এমব্যাসির অন্যসব অফিসারের চাইতে খুব তাড়াতাড়ি লণ্ডনে আমাদের দেশের ছাত্রদের ও সাধারণ লোকদের সঙ্গে আমার আলাপ হয় এবং তাদের সম্বন্ধে অনেক বেশী কিছু জানতে পারি। এ আলাপ সমমনা একই স্তর কিংবা চিন্তাধারার লোকের মজলিসী আলাপ নয়, বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে বিভেদহীন সামাজিক আলাপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, রেস্তোরাঁর বয়, ফ্যাক্‌টরীর মজুর, দোকানের মালিক—হরেক রকম লোকের সঙ্গে নিজেকে তাদের থেকে কোন রকম পৃথক মনে না করে সেই যে ক্ষণিকের আলাপ হতো, তার দামই আলাদা ছিল। একবার শীতের মৌসুমে একজন স্কলারের গায়ে ওভার কোট না দেখে, জিজ্ঞাসা করে জানলাম তিনি বহুদূর থেকে লণ্ডনে এসেছেন। তাঁর এ ওভারকোটটি বন্ধক রেখে ভাড়া জুগিয়ে এসেছেন, এমব্যাসিতে তদবির করতে। তাঁর স্কলারশীপ তিনি পাচ্ছেন না বহুদিন। যার কাছে তাঁর ফাইল ছিল তার নাকি বখরা নেয়ার অভ্যেস ছিল। তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু কয়েক বছর পরে যখন শুনলাম, সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার পর তার চাকরি গিয়েছে, তখন বিশ্বাস করলাম। যাক, স্কলারকে আমার সঙ্গে পরের সোমবারে দেখা করতে বললাম এবং তাঁর ফাইল আমি নিজেই দেখে তাঁকে টাকাটা দিয়ে দিলাম।

সত্যি বলতে কি, এই সব কারণে জুমআ'র নামায আমাকে ধর্মীয় অনুশাসন পালনের উপরেও এমন একটা উদ্ধত মানসিক আনন্দ দেয় যে, এটা পড়ার জন্যে যেন নেশা লেগে যায়। ধরুন গুলশানে আমরা যারা জুমআর নামায পড়ি তারা একজন আর একজনকে যতটা চিনি, অন্যেরা তা' চেনেন না। তাঁরা বহুদিন এক সঙ্গে বাস করেও একলা পড়ে আছেন যেমন আমার বন্ধু প্রিন্সিপ্যাল ওসমান গনি ধান-মণ্ডিতে পড়ে আছে। সে রীতিমত হাদীস ও কুরআনের তফসীর পড়ে, মাঝে মাঝে ওয়াক্তিয়া পড়লেও জুমআর নামায পড়ে না। গত বছর তার ওখানে কোন এক শুক্রবার সকালে যাই, সে আসতে দেয় না; বলে বিকেলে যেও। সুতরাং বাধ্য হয়ে জুমআর নামায পড়লাম সেখান-কার ঈদগাহ মসজিদে। কত পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলো। এবং গুলশানে এতদিনের পরিচিত লোকদের সঙ্গে দেখা হওয়ার চেয়ে তা অনেক বেশী ভালো লাগলো। কারণ যদিও গুলশানে থাকি, ধানমণ্ডিই হল আমাদের মত লোকদের মানসিক বাসস্থান। অর্থাৎ পুরানো অফিসার ও বুদ্ধিজীবিদের যে আড্ডা সেখানে রয়েছে, গুলশানে তা নেই। গুলশানের সেসব লোক তো তাদের বাড়ী ভাড়া দিয়ে ধানমণ্ডিতেই গিয়ে রয়েছেন। এখানে ওমুক ওয়াটার প্রুফ, তমুক সেটা প্রস্তুতকারী বহু শিল্পপতিই রয়েছেন অনেক বেশী, তারা খুবই ভালো লোক; কিন্তু বুদ্ধিজীবি ধরনের লোক না হওয়ায় আলাপের ধারাটা সব সময়ে হয় সামাজিক নয়তো ধর্মীয় পর্যায়ে যায় বলে জুতসই লাগে না। এবার বুঝুন ধানমণ্ডিতে যে থেকেও নেই, আমার সেই বন্ধুর জন্যে আমার কতদূর সহানুভূতি থাকতে পারে।

ওদিনকার এক মজার ঘটনা বলে শেষ করছি। আমি বায়তুল মুকাররমে জুমআর নামায পড়তে গিয়েছি, আমার এক পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর। তার দাড়িতে মুখ ভরা থাকায় আমি প্রথমে চিনতে পারিনি। সে আমার দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলো, "নুরুল মোমেন নাকি?" আমি 'হ্যাঁ' বলতে সে নিজের পরিচয় দিলো। আমি অবাক হয়ে বললাম, "তুমি আব্দুস সাত্তার! আশ্চর্য।" সে বুঝতে না পেরে থতমত খেয়ে বলল, "আশ্চর্য কি বল হে, চিনতে কি এতই অসুবিধা হচ্ছে? দাড়ি না হয় রেখেছি, কিন্তু ভ্রূরু বাঁ ধারে এই যে জরুল এটা দেখেও কি আমার চেহারা

মনে পড়ছে না?" আমি বললাম, "বাইরের চেহারা নয়, ভিতরের চেহারা ধরতেই অসুবিধে হচ্ছে। তুমি ছিলে তখনকার দিনের হিন্দু-ঘেঁষা প্রগ্রেসিভ মুসলমান, হুগলী জেলার বলে তোমার ঠাটই ছিল আলাদা। নামায পড়াটা একটু কেমন কেমন দৃষ্টিতে দেখতে, সেই তুমি জুমআর নামায পড়ছো, চিনতে অসুবিধে তো হবেই।"

আমরা উভয়ে হেসে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলাম। এই ভিতরের পরিবর্তনটা কখন যে হয়ে যায় আল্লাহ্ই জানেন। আল্লাহ্ই জানেন বলতে মনে করবেন না, নামায কি করে আকস্মিকভাবে আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে দিতে পারে তা শুধু মনে করে এ কথাটা বলছি। কি করে এর মধ্যে জাগতিক দৈনন্দিন সে মজা লুকিয়ে আছে সেটা আবিষ্কারের কথা মনে করেও এ বলছি। এই মজাটা যিনি একবারও পাননি তিনি কখনো বুঝতেই পারবেন না যে, শরীর ও মন চাঙ্গা করা কোন ওষুধ খেয়ে তার উপকারিতা অনুভব করে সেটা ত্যাগ করা যেমন কঠিন নামাযেও সেই জিনিসটা যদি কেউ উপলব্ধি করেন তবে তারও সেটা ছেড়ে দেয়া তেমনি কঠিন।

জুমআর নামায আমি অন্যতরো দৃষ্টিতে যে রকম দেখি সেটার যৌক্তিকতা যদি আপনাদের গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে তবে ইনশা আল্লাহ্ নামায পড়ার তেমনি যৌক্তিকতাও গ্রহণযোগ্য হবে আশা করি।

দৈনিক আজাদ
২৩. ১০. ৭৭

প্রায় মাস দুই আগে আমি বলেছিলাম জুমআর নামায একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানতো বটেই, কিন্তু সামাজিক অনুষ্ঠান হিসেবে এর মূল্যও কম নয়। এবং কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে তা' দেখিয়েছিলাম। উদাহরণ দিয়ে মানে সত্যিকার ঘটনার উল্লেখ করে।

সব ঘটনাই ছিল আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ঘটনা। আপনাদেরও জীবনে তা ঘটতে পারে অর্থাৎ আপনি যদি জানেন আপনার কোন আত্মীয় দেশ থেকে এসে বাসাবোতে বাস করছেন কিন্তু তার সঠিক ঠিকানা জানেন না, শুধুমাত্র এই জানেন যে, তিনি নামাযী লোক; তা হলে বাসাবোর দু'তিনটা মসজিদে জুমআর নামায যদি পড়েন তা' হলে একদিন না একদিন তার সাক্ষাত নিশ্চয়ই পাবেন।

আবার এই জুমআর নামাযে বিভিন্ন স্থানে আমার পুরনো বন্ধুদের সাক্ষাত আমি যেমন বহু বৎসর পরে পেয়েছি, আপনারাও সে রকম পেতে পারেন। কিংবা আপনি যদি কোন অফিসের 'বস' হন, তা' হলে আপনি 'জুমআর' নামাযের ওসীলায় আপনার অধীনস্থ কোন ব্যক্তির সত্যিকারের দুঃখ-কষ্টের হদিস নিতে পারেন, কিংবা যদি অধীনস্থ কর্মচারী হন, তা'হলে আপনার 'বস'কে তেমনি আপনার কথা বলতে পারেন। কারণ নামাযের মধ্যে যে দেখা-সাক্ষাত হয়, তাতে মনে শুধু ধর্মীয় উৎকর্ষই সাধিত হয় না, মানবিক মনোবৃত্তির উন্মেষও যথেষ্ট পরিমাণে হয়, যার মধ্যে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ থাকে না এবং মনে সহানুভূতির দরজা খুলে যায়।

অবশ্য প্রত্যেক ধর্মেই একত্রিত হয়ে যেসব অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, তাতে জুমআর নামাযের সামাজিক দিক সম্বন্ধে যা বললাম তার কিছুটা থাকে, কিন্তু তেমন ব্যাপকভাবে থাকতে পারে না। কারণ সেগুলোতে সে রকম থাকার অবকাশই নেই। কেন? বলছি।

জুমআর নামায একটি সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান। এর মধ্যে উচ্চ-নীচ, কালো-সাদা, গরীব-বড়লোক কিংবা বিভিন্ন মতের কিংবা বিভিন্ন পথের লোকদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ যে থাকে না, শুধু তাই নয়; এই ভেদাভেদ দূর করার জন্যেই প্রতি ওয়াক্ত মসজিদে দৈনিক জামায়াতে নামাযের যে নিয়ম তারই সাপ্তাহিক পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পায় এই জুমআর নামাযে।

যা হোক, আমার সেই আগেকার লেখাটায় জুমআর নামাযের সামাজিক ফযীলত হিসেবে কিছু কথা বলেছিলাম।

সেটা লেখার পর আমার এক বেয়াই, মহাখালী ওয়্যারলেস স্টেশনের ইঞ্জিনিয়ার জনাব আব্দুল বাতেনের কাছে যা শুনলাম তাতে বিস্ময়ে পুলকিত হয়ে উঠলাম।

তিনি ট্রেনিং-এর জন্যে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড শহরে যান। তিনি আমার সেই লেখাটির প্রেক্ষিতে বললেন যে, তাঁরা এডিলেডে প্রতি রবিবারে জুমআর নামায পড়তেন। আমি অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "প্রতি রবিবারে জুমআর নামায! সে কি রকম?" তিনি যা বললেন তা এই রকম: তিনি এডিলেডে এই রকম ভিন্ন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়লেন যে, সেখানে মুসলমান কারা কারা আছেন জানার জন্যে অস্থির হয়ে গেলেন। তখন তাঁকে বলা হলো যে, এক জায়গায় প্রতি রবিবারে এডিলেডে যত মুসলমান আছেন তাঁরা মিলিত হন। তিনি পরের রবিবারে সেখানে গিয়ে দেখলেন এডিলেডে যে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন মুসলমান রয়েছেন তারমধ্যে তিনজন বাংলাদেশীও আছেন, তারা সবাই এসেছেন। এবং জুমআর নামায পড়তে এসেছেন। অর্থাৎ তারা জোহরের ফরয নামায প্রতি রবিবারে একত্রে পড়েন এবং তার পূর্বে 'খুৎবাহ পাঠ' করা হয়। প্রত্যেক শুক্রবার কাজের দিন থাকায় শহরের দূরবর্তী স্থানসমূহ থেকে তারা এসে একত্রে মিলিত হতে পারেন না বলেই প্রতি রবিবারে একত্রিত হন। এ হলো গিয়ে তাঁর রবিবারের জুমআর নামাযের বিবরণ।

অর্থাৎ মিলনটাকে ধর্ম-ভিত্তিক করে মিলনটাকে শুধু যে জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকল মুসলমানের করে তুলেছেন তাই নয়, সেটাকে অবশ্যকরণীয় করে তুলে মিলনকে যথাবিহিত নিয়মিত করেও তুলেছেন।

শুধু সামাজিক মিলন হলে সেটা অতটা নিয়মিত হতো না, কিংবা তার মধ্যে জমাটভাবে সবাই যে এক, সে ধারণাও আসতো না।

সেখানে তো জুমআর নামায ফরয ছিল না। কারণ নবী করীম (সঃ)-এর এক হাদীসের মর্মানুযায়ী জোহরের নামাযের স্থলে জুমআর নামায আদায় করা তখনই সিদ্ধ হয় যখন ঃ

১. জুমআর নমাযের জন্যে শহর কিংবা শহরসংলগ্ন নগর কিংবা গ্রাম থাকে।
২. দেশে মুসলিম শাসক কিংবা কাযী নিযুক্ত থাকেন।
৩. নামাযের পূর্বে খুতবাহ দান করা হয়।
৪. নির্দিষ্ট ওয়াক্তের মধ্যে নামায আদায় করা হয়।
৫. অন্যান্য চারিজন মুক্তাদী (ইমাম ছাড়া) মৌজুদ থাকে।
৬. মসজিদে প্রবেশের কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে।

মোটামুটি এগুলি হলো জুমআর নামায আদায়ের শর্ত। তা' যখন সেখানে ছিল না, তখন অবশ্য সেখানে জুমআর নামায আদায়ের কোন প্রশ্নও ওঠে না।

কিন্তু জুমআর অর্থ যখন একত্রিত হওয়াও ; তখন তাদের মিলনটা নামাযের অর্থে না হলেও সামাজিক অর্থে জুমআর নামায বলা যেতে পারে। এবং জুমআর পরিবর্তে জোহরের নামায যখন জামায়াতে পড়া হতো তখন তাদের নামায যে ঠিক হতো শুধু তাই নয়, তাদের মনে জুমআর নামাযের ভাবটাও আসতো। এই ছিল সে নামাযের প্রকৃত উদ্দেশ্য। খুতবার মাধ্যমে ধর্মীয় ঐতিহ্যের স্মৃতি আনা হতো মাত্র।

একটা জিনিস আমরা ভুলে যাই, যদি ধর্মকে পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় করে কেউ দৈনন্দিন জীবন সাধারণভাবে যাপন করতে চায় তাহলে ইসলাম ধর্ম সব চাইতে মানবিক। উপরোক্ত উদাহরণটিকে যদি আমরা অনুশীলন করি, তা'হলে তার মধ্যেও এর সত্যতা প্রতি-ভাত হবে।

ধরুন আপনি যদি খৃস্টান হন, তা'হলে রবিবার ছাড়া অন্য কোন দিনে এবং গির্জা ছাড়া কোন জায়গায়, এডিলেডের ঐ কতিপয় ভদ্রলোকের মত, অন্য খৃস্টানদের সঙ্গে কোন ধর্মীয় উপাসনায় মিলিত

হতে পারতেন না। তারপর প্রশ্ন উঠতো আপনি রোমান ক্যাথলিক কিংবা প্রটেস্ট্যান্ট, কালা কিংবা সাদা কি না? পারতেন না এ জন্য যে, রবিবারের মিলিত অনুষ্ঠানের বাইরে আমাদের ওয়াক্তিয়া জামায়াতের মত একত্রে অবশ্য করণীয় কোন অনুষ্ঠান খৃস্টানদের নেই। এমন কি আপনি যদি য়াহুদী হন তাহলেও শনিবার ছাড়া ঐ ধরনের ধর্মীয় মিলন অনুষ্ঠানের কোন রেওয়াজ স্থাপন করতে পারতেন না; কারণ য়াহুদীদের পক্ষেও সেরকম কোন ধর্মীয় ব্যবস্থা নেই। হিন্দু কিংবা বৌদ্ধদের বেলায় আরও ব্যতিক্রম হোত। কারণ তাদের ধর্মীয় সার্বজনীন উৎসব আমাদের ঈদ-বকরাঈদের মত বিশেষ বিশেষ সময়ে সংঘটিত হয়।

ব্যক্তিগতভাবে এই ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিন্দুদের মধ্যে আশা করা প্রায় অসম্ভব। কারণ যদি বা তাদের সকল বর্ণের লোক সাধারণভাবে সভা-সমিতিতে মিলিত হতে পারেন; কিন্তু এ ধরনের ব্যক্তিগতভাবে করণীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তাদের মিলন তেমন সার্বজনীন হতে পারে কি না তা চিন্তার বিষয়।

আর একটা সত্য উপরোক্ত রবিবারের জুমআর নামায থেকে প্রতিভাত হয়; সেটা হলো মানুষ হিসেবে বিদেশে আমরা আপন লোক খুঁজে বেড়াই। যদি দেশের লোক পাই তো কথাই নেই, যদি না পাই তা'হলে যে জিনিস আমাদেরকে টানে সেটি হলো ধর্ম, সমধর্মের লোক আমরা খুঁজে ফিরি এবং তাদের কাউকে পেলে খুশী হই। এ ধর্ম 'আইট-ইজমের'-ও যে না হতে পারে তা' নয়, তবে সত্যিকার পুরনো অর্থে যে ধর্ম বুঝি সেটাই হয় বেশী। সে ক্ষেত্রে বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সার্বজনীন আবেদন রয়েছে যেটায় সেটাই হলো ইসলাম। সুতরাং মুসলমান হিসেবে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মিলিত হওয়াটা সবচাইতে যে সার্থক হয় তার একটি উদাহরণ হলো ঐ এডিলেডে 'রবিবারের জুমআ।'

দৈনিক আজাদ
১৯. ১২. ৭৬

ইসলামের যে কোন নীতি, যে কোন ঘটনা, যদি আধ্যাত্মিক স্তর থেকে নামিয়ে দৈনন্দিন জীবনে গ্রহণ করার মত না করা যায়, তা' হ'লে তা' স্মরণ করার জন্যে আমাদের মানসিক কিংবা আধ্যাত্মিক উন্নতি যতই হোক না কেন, তা' জীবনে প্রয়োগ করে জীবনকে সফল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করবে।

কারণ ইসলাম মানুষের ধর্ম, যে মানুষ শুধু আধ্যাত্মিক চিন্তাই করে না, শুধু রাজপ্রাসাদে বাসই করে না, যে মানুষ বেঁচে থাকার চিন্তায় খেটে খায়, সমাজের ভালো-মন্দের মধ্যে নিজেকে সার্থক করার চিন্তা করে, সেই মানুষের ধর্ম।

এবং আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হলেন এর সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে জীবনকে মাটির মানুষের মত যাপন করে তার উদাহরণ রেখে গেছেন তিনি। রাজাধিরাজের মত জীবন-যাপনের মৌকা থাকা সত্ত্বেও, নিজে খেটে খেয়েছেন, দীন-দুঃখীর মত না খেয়ে, বরং বলা যায়, খাবার সংগ্রহ করতে না পেরে, উপোষও করেছেন। সুতরাং, ইসলাম শুধু তত্ত্বকথার ধর্মই নয়, প্রকৃত দৈনন্দিন জীবন-যাপনের ধর্মও। কারণ প্রতিটি তত্ত্বকথা জীবন যাপনের সহায়ক।

এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কারবালার সেই হৃদয়-বিদারক ঘটনা কিভাবে দেখছি? আমরা এটা প্রতি বৎসর পালন করছি, মাতম করছি, এবং যতদূর সম্মানের সঙ্গে পারি, তা' স্মরণ করছি। ঠিক যেমন আমরা শহীদ দিবসগুলি পালন করি।

এই তুলনা দিলাম এই জন্যে যে, ভাষায় যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের জন্যে একদিন যতটুকু করার পূর্ণমাত্রায় করে পরে তা' ভুলে যাই। ভুলে যাই মানে এই নয় যে, আমরা প্রতিদিন তা' করবো। ভুলে

যাই এই জন্যে বলছি যে, তদের স্মরণ করার আসল মাধ্যম হলো বাঙলা সাহিত্যের জন্যে, বাঙলা ভাষার জন্যে বাঙলা চিন্তাধারাকে উন্নত করার জন্যে প্রত্যেকের দিনকে দিন যে আপ্রাণ চেষ্টা করার কথা, সেটাই করছি না।

মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদেরও একদিনই স্মরণ করে পরে ভুলে যাই। এখানে ভুলে যাওয়ার অর্থ হলো, তারা দেশে স্বাধীনতা আনতে, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করার অবকাশ দিতে যে জীবন ত্যাগ করলো, সে স্বাধীনতা রাখতে এবং সেই স্বাধীনতার ফল মানুষের কাছে পৌঁছাতে আমরা রোজকে রোজ কিছুই করছি না। মানুষ মানুষের উপর অন্যায় আধিপত্য করছে, অন্যায়ভাবে খাদ্য, পরিধেয় এবং অন্যান্য নানা ধরনের বাঁচার সামগ্রী থেকে বঞ্চিত করছে দিনকে দিন; অথচ তা' আমরা সহ্য করছিও দিনকে দিন। যে মানুষ খেতে পারছে না, তাদেরও যেমন অঢেল জন্ম দিয়ে যাচ্ছি দিনকে দিন, তেমনি যে মানুষ অত্যাচার করছে, লুটেপুটে খাচ্ছে, তাদেরও সংখ্যা বাড়াচ্ছি প্রতিদিন। সুতরাং, এর কোনটার জন্যেই মুক্তিযোদ্ধারা জীবন দেয়নি; বরং এগুলো রোধ করার জন্যেই তারা জীবন দিয়েছিল।

এবার পবিত্র আশুরার কথায় আসছি।

আশুরার তাৎপর্য কি? দু'টি মত দিয়ে পরে আমার নিজের কথা বলতে চাই।

একটি মত ঃ "একদিকে স্বৈরাচারী শাসক ইয়াজিদের ক্ষমতার দম্ভ অন্যদিকে নবী দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর ন্যায়নিষ্ঠা। সংগ্রামের মধ্য দিয়া সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন ইমাম হোসেন (রাঃ)।...ইতিহাসের শিক্ষা গ্রহণের ধারায় মুহররমের সেই শাশ্বত শিক্ষায় যদি আমরা অনুপ্রাণিত হতে পারি, যদি জীবনের প্রতিটি চিন্তা-ভাবনায় ও প্রতিটি কাজেকর্মে আমরা সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য চিনিয়া লইতে পারি, যদি পারি বৃহত্তর প্রয়োজনের ডাকে সাড়া দিয়া অকাতরে আত্মবিসর্জন দিতে, তবেই মুহররমের শিক্ষা জীবনের শিক্ষায় রূপান্তরিত হইবে।"

অন্য মতটি হলো ঃ "সব কিছু ছাপাইয়া একটি মূল্যবোধের জয়দৃপ্ত ঘোষণাই বারবার শুনা গিয়াছে। শুনা গিয়াছে সত্য, ন্যায় ও গণতন্ত্রের উর্ধ্বে কিছুই নয়। যদি বাঁচিতে হয় তবে সত্য, ন্যায় এবং

৬—

গণতন্ত্রের জন্যই বাঁচিতে হইবে, যদি মরিতে হয়, তবে সত্য, ন্যায় এবং গণতন্ত্রের জন্যই মরিতে হইবে। এই আদর্শকে সম্মুখে লইয়া হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) অসত্য, অন্যায় এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া উঠিয়াছিলেন।---শহীদ হওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু হযরত হোসেন (রাঃ)-এর শাহাদত তুলনাহীন।"

এবার আমার নিজের কথা বলি। আমি প্রথমেই বলেছি যে কোন ধর্মীয় তাৎপর্য যদি আমরা দৈনন্দিন জীবন-যাপনের স্তরে এনে তার দ্বারা জীবন-যাপন না করতে পারি তা' হলে তার আধ্যাত্মিক মূল্য আমাদের মনকে যতই আলোকিত করুক না কেন, তা' পরিপূর্ণভাবে জীবনে উপলব্ধি করিয়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজকে তাছির করবে না।

উপরোক্ত সুধীজন যা বলেছেন তা' সর্বতোভাবে সত্য এবং উচ্চ দার্শনিক কথা। কিন্তু বুঝে তার থেকে দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগানোর ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশ গ্রহণ করা কিছু কঠিন মনে হয়।

একটা কথা,—যেটা আমি খুব বেশী করে এ ক্ষেত্রে অনুভব করি, সেটা হলো এই যে, ১০ই মুহররমে, আশুরায়, যে হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) শহীদ হলেন, সেটা আল্লাহ্‌র বিশেষ ইচ্ছায়। কারণ এই শাহাদতের পূর্বে ১০ই মুহররম ছিল মুসলমানদের জন্যে একটি অত্যন্ত আনন্দের দিন। এ দিনে যতদূর আমার মনে পড়ে, হযরত আদম (আঃ)-এর সঙ্গে পৃথিবীতে বিবি হাওয়ার সাক্ষাত হয় ; হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকা শুকনো তীরে ভেড়ে ; হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেট থেকে বেরিয়ে আসেন, এমনি বহু আনন্দময় ঘটনা ঘটে। সুতরাং এই দুঃখের ঘটনা— আল্লাহ্‌র বিশেষ ইচ্ছায় এটা ঘটেছিল এবং এটা ঠিক সেই উদ্দেশ্যে, যে উদ্দেশ্যে কবি ইকবাল বলেছেন :

"কতলে হোসাইন আসল মেঁ
মরগে ইয়াজিদ হ্যায়
ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর
কারবালা কে বাদ।"

অর্থাৎ হোসেন (রাঃ)-এর মৃত্যু আসলে ইয়াজিদেরই ধ্বংস, কারণ প্রত্যেক কারবালার পর ইসলাম বেঁচে ওঠে।

এই মৃত্যুটা আল্লাহ্‌ ঐ দিনই চেয়েছিলেন, ইসলামকে আবার বাঁচানোর জন্যে। এবং এই মৃত্যুটা এমনভাবে ঘটিয়েছিলেন যাতে

আমরা বলতে পারি, "শহীদ হওয়ার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক আছে। কিন্তু হযরত হোসেন (রাঃ)-এর শাহাদত তুলনাহীন।"

আল্লাহ্ কোন আন্দোলনকে, অত্যাচারীর পক্ষ থেকে সার্থক করতে চাইলে, তিনি তাঁদের মধ্যে শাহাদত ঘটাবেনই ; নইলে মানুষ উদ্দীপনা পাবে কোন্ সূত্রে ? ধরুন, যদি ভাষা আন্দোলনে ওরা না মরতো, তা' হ'লে ভাষা আন্দোলন অত সার্থক হতো না। একটা লোকও যদি না মরতো তা হ'লে মানুষ যেমন মরিয়া হয়ে এগিয়ে গিয়েছিল, তা' যেত না।

হয়তো সমঝোতায় ভাষা আসতো ; কিন্তু তা যদি আসতো তা হ'লে তাদেরকে স্মরণ করে যে গভীর বেদনায় প্রতি বৎসর ভাষাকে উদ্দেশ্য করে আমরা এর সেবা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, পরে বেশীর-ভাগ তা' ভুলে গেলেও তার যে একটা শুভ প্রতিক্রিয়া হয়, সেটা হওয়ার কোন অবকাশই সৃষ্টি হতো না। তেমনি মুক্তিযুদ্ধেও এই অগণিত মৃত্যুই মানুষকে স্বাধীনতার জন্যে পাগল করে ছেড়েছিল ; এই মৃত্যুই দেখিয়েছিল অত্যাচারিত শাসকগোষ্ঠীকে খতম করতে না পারলে কি দশা হতে পারে তার নমুনা। এই জন্যেই মৃত্যুকে ইসলামে আল্লাহ্র নিয়ামতও বলা হয়।

এই মৃত্যুর দরকার ছিল ঐ সময়ে। হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহ আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুর আমার যতদূর মনে আছে, মাত্র বছর পঞ্চাশ পরে কারবালায় এই শাহাদত ঘটিত হয়, একজনের নয়, একটি সম্পূর্ণ পরিবারের, সম্পূর্ণ কাফেলার। এবং এই মৃত্যু ঘটিয়েও ইয়াজিদ রাজত্ব করে গিয়েছিল নির্বিবাদে। তা' হলে বুঝতে পারেন, মুসলমানগণ কোন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিলেন। সুতরাং, এই ঘটনা ঘটিয়ে আল্লাহ্ মুসলমানদের ঈমান আবার ঝালাই করার অবকাশ দিলেন। এই মহাবেদনা, যেটা আল্লাহ্ মুসলমানকে দিলেন, সেটাই তখন যে মুসলমানদের চিন্তাধারা অত্যন্ত নিবিড়ভাবে ধর্মমুখী করেছিল, তা তখনকার সুধীদের চিন্তাধারায় প্রকাশ পায়।

এই ঘটনাতে বলা হয়, সত্য ও ন্যায়, মিথ্যা ও অন্যায়ের উপর জয়লাভ করেছে। কিন্তু কি করে? একথা আমি ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। কিন্তু কি করে তা' বুঝে উঠতে পারিনি। কি করে বুঝবো? কারণ যেখানে ইয়াজিদ মিথ্যাচারণ করে জয়লাভ করলো, সেখানে মিথ্যার উপর সত্য জয় লাভ করেছে বলা যায় কি করে?

এটা উপলব্ধি করতে হ'লে কাছের একটা ঘটনা বিশ্লেষণ করতে চাই। নওয়াব সিরাজউদ্‌দৌলা, আপনারা সবাই জানেন, সত্যিকারভাবে মীরজাফরের কথায় বিশ্বাস করেছিলেন, এবং এত বিশ্বাস করেছিলেন যে, তাকে পদচ্যুত করার শক্তি ও মেজাজ থাকা সত্ত্বেও তা করেন নি। ফলে তিনি হারলেন এবং তাঁর প্রাণ গেল। কিন্তু আপনি বলতে পারেন যে, এ ক্ষেত্রে সত্যের কাছে মিথ্যা হেরে গিয়েছিল? না। কারণ, আমাদের সামনে ইতিহাসে একজন মীরজাফর তৈরী হওয়ার দরকার ছিল, যাতে এখনও ঐ ধরনের দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক লোককে চিহ্নিত করতে আমাদের অসুবিধা না হয়। এবং এদের বিরুদ্ধে আমরা যেন সতর্ক থাকতে পারি। ধরতে গেলে সত্যের খাতে ইতিহাসকে বহানোর জন্যেই এই মিথ্যা আচরণ। কারবালায় হযরত ইমাম্ হোসেনের (রাঃ) যাওয়াটা ছিল, অত্যন্ত ভুল করে যাওয়া। ইচ্ছা ছিল জনগণ যে রকম চায় সেই রকমই হোক এবং ইয়াজিদ অনেকটা সেই ধারণাই দিয়েছিল। কিন্তু হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) ছিলেন এত সত্যসেবী মানুষ যে, ইয়াজিদ কতদূর মুনাফিক হতে পারে, তা' কল্পনাও করতে পারেন নি। কিন্তু যখন জানতে পারলেন ইয়াজিদের মন; তখন তিনি মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করলেন না। রুখে দাঁড়ালেন তাঁর সত্য বিশ্বাস রক্ষা করার জন্যে। এবং এত নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের মুখেও টললেন না। এখানেই হলো মিথ্যার উপর সত্যের জয়। নজরুল ইসলামের "শির দেগা, নাহি দেগা আমামা।"—এ কথাটা আমার খুব বেশী করে মনে পড়েছিল, বহু বছর আগে দামেশ্‌কের বড় মসজিদে, যেখানে হযরত ইয়াহিয়া (আঃ)-এর কবর রয়েছে, তারই দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ)-এর শুধু মাথার কবরটা দেখে। কবরটি পিলারের মত একটি উঁচু আবরণের নিচে রয়েছে।

মিথ্যাচারীর সঙ্গে আপোষ নেই; অত্যাচারীর কাছে নত হ'তে নেই; সম্মান ও সত্যনিষ্ঠা প্রাণের চেয়েও প্রিয়, এই হলো মুহররমের শিক্ষা। সুতরাং আমাদের এই মুনাফিকের দেশে, সম্মান জ্ঞান নাই যে দেশে—সে দেশে, প্রতিদিনের জীবনে আমরা ঐ শিক্ষাকে একটু চিন্তা করলেই সহজে কাজে লাগাতে পারি। কারণ, ধরতে গেলে বর্তমান বিশ্বে প্রতিদিনই আমাদের আশুরা।

দৈনিক আজাদ
২৫. ১২. ৭৭

আমি এর আগে একটি লেখায় বলেছি, "যে-কোন ধর্মাবলম্বী তার ধর্মকে বোঝার সবচাইতে শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে, প্রথমে নির্বিচারের তার ধর্মকে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে গ্রহণ করা, এবং পরে সুক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি দিয়ে ক্রমে ক্রমে উহার ধর্ম উপলব্ধি করা।"

এবং আরো বলেছি, "প্রত্যেক ধর্ম-ধর্মীদের এই ধরনের বিচারের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে সাধারণ মানুষের জন্যে তার ইহলৌকিক ও পারত্রিক হিতসাধনে, কোন ধর্ম যদি সর্বাপেক্ষা বেশী সাহায্য করতে সক্ষম হয়, তা'হলো ইসলাম। এর কারণ এ নয় যে, অন্যধর্মে মানুষের ইহলৌকিক ও পারত্রিক উন্নতি লাভের ব্যাপারে হিতোপদেশের কোন কমতি রয়েছে। এর একমাত্র কারণ ইসলাম জীবনধর্মী এমন একটি মানবিক ধর্ম, যার মধ্যে দৈনন্দিন প্রত্যেকটি সৎকাজ ইবাদতের শামিল করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক উপাসনাতেই শুধু ইবাদত, অন্যান্য ধর্মে যেমন হয়, তেমন শেষ হয় নাই। পথ চলতে কথাবার্তা বলতেও ইবাদত।

এহেন ক্ষেত্রে ঈদ-উল-আজহাতে আমরা যে কুরবানী করি, সেটাকে শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদত ধরলে আমাদের কুরবানী কবুল হলেও, যে পর্যন্ত না আমরা তার পূর্ণ তাৎপর্য বুদ্ধি দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি সে পর্যন্ত তার মধ্য থেকে পূর্ণ ইবাদত হাসিল হবে না। এবং এই উপলব্ধি করাটা সহজ ব্যাপার নয়। দেখুন হযরত ইবরাহীম (আঃ) পর্যন্ত প্রথমে উপলব্ধি করতে পারেন নাই, যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ তাঁকে নির্দিষ্ট আদেশ দিয়েছিলেন।

প্রথম রাতে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে স্বপ্নে আদেশ করলেন, "হে ইবরাহীম, কুরবানী কর।" তিনি সকালে উঠে একশত উট কুরবানী করলেন। কিন্তু সেটা ঠিক হলো না। দ্বিতীয় রাতেও আল্লাহ্ অনুরূপ স্বপ্নে দেখালেন। পরের দিনও আবার একশত উট কুরবানী করলেন

কিন্তু তাও ঠিক হলো না। তৃতীয় রাতেও অমনিভাবে স্বপ্নে আদিষ্ট হলেন, এবং কুরবানী করলেন। সেটা গৃহীত হলো না। চতুর্থ রাতে নির্দিষ্ট আদেশ পেলেন, "হে ইবরাহীম! তুমি তোমার প্রাণে চেয়ে যাহা প্রিয় তাহাই কুরবানী কর।" তখনই তিনি বুঝতে পারলেন তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় ছিল যে শিশুপুত্র ইসমাঈল, তাঁকেই আল্লাহ্ কুরবানী করতে বলেছেন। এটা লক্ষ্যণীয় যে, আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর পুত্রকে কুরবানী করতে বলেন নাই, তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করতে বলেছিলেন। এবং যেহেতু হযরত ইবরাহীম (আঃ) নিশ্চিত জানতেন যে, তাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয় হলো তাঁর পুত্র, সেই জন্য তাঁকে কুরবানী করতে নিয়েছিলেন। আল্লাহ্ চান নাই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) সত্যিকারভাবে ইসমাঈলকে কুরবানী করুন তাই তিনি প্রতীক হিসেবে দুম্বার কুরবানী গ্রহণ করলেন। এবং এটাকে যে প্রতীক করেছিলেন, তা আল্লাহ্ আমাদের জন্যেই করেছিলেন।

সুতরাং আমরা যখন কোন জানোয়ারকে কুরবানী করি তখন যদি সেটা আমাদের প্রাণের চেয়ে প্রিয় কোন বস্তুর কুরবানীর শামিল না ধরতে পারি তা'হলে সেটা শুধু আনুষ্ঠানিক কুরবানী হবে; আল্লাহ্র আদেশ পালন করলেও ব্যক্তিগতভাবে তার দৈনন্দিন তাছির আমাদের জীবনে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের সমাজের হিতের জন্যে কোন ত্যাগ স্বীকারে তা উদ্বুদ্ধ করবে না।

এই কুরবানী করার বাধাগুলি হ'লো সর্বাপেক্ষা প্রবল। মানে জীবন অপেক্ষা প্রিয় বস্তুর এই প্রতীক কুরবানী। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বেলায় দেখুন। তিনি এই কুরবানীতে তাঁর স্ত্রী থেকে, তাঁর পুত্র থেকে বাধাপ্রাপ্ত হবেন এটা মনে করে দাওয়াত খাওয়ার কথা বলেছিলেন। তাঁরা রাজী হ'লেও শয়তান নিশ্চুপ ছিল না। সব এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু তিনি নিজের দিকটা বিচার করেন নাই, কারণ আল্লাহ্র প্রতি তাকওয়া তাঁর এত বেশী ছিল যে, এই কুরবানীর জন্যে একটুও কাতর হন নাই। কিন্তু তাঁর দিকটা দেখেছিলেন শিশু ইসমাঈল।

আল্লাহ্র রাহে কুরবানীর কথা শুনে তিনি খুবই খুশী হলেন। এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে তিনটি অনুরোধ করলেন। প্রথম ঃ তাঁর হাত-পা বাঁধতে, যাতে তিনি হাত-পা নাড়লে রক্ত ছিটে তার কাপড়ে না যায়; দ্বিতীয়তঃ তাঁর মুখ জমিনে রেখে ছুরি চালাতে, যাতে তাঁর প্রতি ভাল-

বাসা হযরত ইবারহীম (আঃ)-কে বাধা না দেয়। তৃতীয়তঃ তাঁর জামা নিয়ে তাঁর আম্মাকে দিতে বললেন, যাতে তিনি সান্ত্বনা লাভ করতে পারেন।

কিন্তু যেটা ঘটতে পারতো সেটা ঘটেনি, যেটা ঘটলো সেটা প্রতীক হিসেবে ঘটলো। কেন?

এর উত্তর সত্যিকার মুসলমান হিসেবে আমার কাছে যা' মনে হয়েছে, তা বলবো। মানুষের ধ্যান-ধারণা অসীম, কারণ মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। এই ধ্যান-ধারণা যেন সব সময়ে সর্বক্ষেত্রে বেরিয়ে আসতে পারে না। কিন্তু হঠাৎ যদি কোন ব্যাপারে নির্ঝরের মত কোন সত্য ফাটল বেয়ে বেরিয়ে আসে, তা' হ'লে তা' যেমন করে মনকে বিচলিত করে তেমনি করে ফাটল দিয়ে বেরিয়ে আসা একটা সত্য আবিষ্কারে মন বিচলিত হয়ে উঠলো।

আমার মনের এদিকের সত্যের দুয়ার খুলে গেল যেন, এবার ঈদ-উল-আযহার নামায আদায় করতে গিয়ে। নামায হওয়ার কথা ছিল গুলশান ঈদগাহে। কিন্তু যেভাবে বৃষ্টি পড়ছিল তাতে ছাতি মাথায় করে বেরিয়ে পড়লাম এবং একটি রিক্সাকে বললাম, "মসজিদে চলো"। কারণ এর আগে এরকম বৃষ্টিতে ঈদগাহে জামায়াতের কথা থাকলেও মসজিদেই সব সময় হয়েছে। রিক্সওয়ালা জিজ্ঞাসা করলো, "হুজুর মসজিদে কেন?" আমি বললাম, "নামায পড়তে, সে বললো, 'সার' নামায ঈদগায় হবে, এই মাত্র আমি কয়েকজনকে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দিয়েছি।" আমি ঈদগাহে গেলাম। গিয়ে দেখি তাঁবুর যেখান সেখান দিয়ে পানি পড়ছে, অনেক জায়গায় নামাযের ফরাশ চপচপে ভেজা। একবার মনে করলাম বনানী যাই, সেখানে মসজিদের মধ্যে জামায়াত হয়। কিন্তু আবার মনে করলাম, গুলশান নিজেদের জায়গা, এখানেই পড়বো। ভাগ্যিস তা মনে করেছিলাম, কারণ পনের মিনিটের মধ্যে আমার মনের দুয়ার-বন্ধ সত্য যেভাবে বেরিয়ে এলো, তাতে মনে করলাম, বনানীতে নামায পড়তে গেলে এ সত্য আবিষ্কারের অবকাশ তো ঘটতোই না, এমনকি এই সত্য আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে নতুন করে কুরবানীর তাৎপর্যও বুঝতে পারতাম না। যখন বুঝলাম তখন আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় করলাম।

পানি পড়ছে চাঁদোয়ার নানাদিক থেকে। চাঁদোয়ার খুটি দেয়া উঁচু জায়গা, যেখান থেকে পানি সরে যায়, এমন জায়গায় নিজে দেখলাম

বেশ শুকনো রয়েছে। আরাম করে গিয়ে সেখানে বসলাম ; তখনো প্রায় পঁচিশ মিনিট বাকী নামাযের। লোক আসতে লাগলো। সবাই অমনি করে বেছে বেছে বসতে লাগলো। সামনের দেড়-দু' কাতার একেবারেই খালি। মিনিট দশেক পরে ইমাম সাহেব বললেন, "আপনারা সব এগিয়ে এসে কাতার পূর্ণ করুন।" দু'চারজন গেল। কিন্তু তাতে কিছুই হলো না। তারপর হঠাৎ বাতকে বাত যেমন বলা হয় তেমনি ইমাম সাহেব বললেন, "দেখুন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এই দিনে কতটা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন, আর আপনারা পানিতে ভিজে জামায়াত পুরো করার ত্যাগ স্বীকার করতে দ্বিধা করছেন। যদি কাতার না পূর্ণ করেন তা'হলে তো নামাযই ঠিকমত আদায় হ'বে না।" প্রথমে একটু দ্বিধার সঙ্গেই বসেছিলাম। কিন্তু দু'এক মিনিট মাত্র। হঠাৎ মনে হলো তাই তো, যে আমি আমার সম্পূর্ণ পরিবারের জন্যে কুরবানী করছি, এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে অপারগ ! আমার তাকওয়ার কি দাম আছে ? কুরবানীর শিক্ষা আর কি ভাবে হতে পারে ? জীবন দিয়ে যদি তা' উপলব্ধি করতে না পারি, তবে এ কুরবানীর দাম আল্লাহ্‌র কাছে কি হতে পারে ? এই আরামটুকু আমার সব চাইতে প্রিয় ছিল ঐ সময়, সুতরাং মনে করলাম ওটা যদি ত্যাগ করে নির্বিচারে কাতার পূর্ণ করি তা হ'লে সেটাই ঐসময়ে হ'বে আমার সত্যিকারের তাৎক্ষণিক ত্যাগের মাধ্যমে বড় ধরনের ইবাদত। এবং যেমনি এ কথা মনে হলো, অমনি এমন দ্বিধাহীনভাবে এগিয়ে গেলাম, যেন আমি অন্য মানুষ। গিয়ে ঠিক কাতার পুরতে যেখানে দরকার সেখানে যখন দাঁড়ালাম, তখন দেখলাম এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছি যে ধারা বেয়ে পানি নিচে পড়ছে এবং তা আমার বাম স্কন্ধের উপর পড়ছে। একটু এদিক-ওদিক সরে ভাল জায়গা পেতাম, কিন্তু তখন ভালো জায়গার আর কোন দাম ছিল না, আমার মনে। বরং আমি আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করলাম। এবং ঐখানে ঐ পানির মধ্যে বসেই এই নতুন উপলব্ধির আলোকে চিন্তা করতে লাগলাম।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) ও শিশু ইসমাঈল (আঃ)-দের সম্পূর্ণ ঘটনাগুলি এই আলোতে নতুন করে চিন্তা করতে লাগলাম। সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু কুরবানী-ই হলো এই কুরবানীর প্রতীক ; পশুটা অনুষ্ঠান মাত্র। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্ পুত্র কুরবানী করতে বলেন নি,

বলেছিলেন তাঁর প্রাণের চাইতে প্রিয় বস্তুকে কুরবানী করতে। প্রাণের চেয়ে প্রিয় বস্তুই আমাদের কুরবানী করতে হ'বে, পশুটা আল্লাহ্ দিয়েছিলেন যেমন প্রাণাপেক্ষা প্রিয় বস্তুর বদলাতে। আমাদের বেলায়ও তাই।

এবার ধরুন, একটা লোক কালোবাজারে লক্ষ লক্ষ টাকা রোযগার করছে, সে দশ বিশ হাজার টাকা দিয়ে একটা গরু কুরবানী দিলো, তাতে কি যাবে-আসবে? তার সব চাইতে প্রিয় জিনিস হলো এই কালো-বাজার করা। সে যদি কুরবানীর সময় মনে করে ঃ আল্লাহ্! এই অন্যায় আয়কে এই সঙ্গে বিসর্জন দিচ্ছি—তা'হ'লে তার কুরবানী সত্যিকার কুরবানী হ'বে। নইলে তা' শুধু আনুষ্ঠানিকই থাকবে।

কিংবা ধরুন, কেউ কোন রাষ্ট্রের কর্ণধার রয়েছেন, তিনি তাঁর পুত্রকে অন্যায্যভাবে বড় হতে সাহায্য করছেন, তা'হলে এই কুরবানীর সময় যদি তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁর সব চাইতে প্রিয় বস্তু তার পুত্রের স্বার্থকে তিনি এই সঙ্গে কুরবানী দিচ্ছেন, তা'হলে তাঁর আনুষ্ঠানিক কুরবানীটাও সত্যিকার কুরবানীতে পর্যবসিত হ'বে।

শিশু ইসমাঈল (আঃ)-এর দিকটা আলোচনা করলে আবার এটা বোঝা যাবে যে, তাতে এই ধরনের বাধা-বিঘ্নের বহু প্রতীক রয়েছে। পিতার যাতে দুর্বলতা আসতে পারে, তাঁর নিজের দুর্বলতা আসতে পারে, সেসব সেখানে চিন্তা করা হয়েছে। সর্বোপরি শয়তানের বাধা সৃষ্টির কথাও অনুপস্থিত নেই। অর্থাৎ এইসব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আমাদের যেতে হ'বে সত্যের পথে, এই হলো ঈদ-উল-আযহার নির্দেশ।

সুতরাং যে কাজই যেই করুক, যদি তা নিজের আত্মার উন্নতির বাধা দেয়, দেশের ও সমাজের উন্নতির বিঘ্ন সৃষ্টি করে, কিংবা দেশ-প্রেমের অন্তরায় হয়, তা হ'লে এই আনুষ্ঠানিক কুরবানীর সময় যদি সত্যিকারভাবে মনে মনে সেগুলোকেও কুরবানী করে শেষ করে দেয়া হয়, তা হলেই আমি মনে করি এই কুরবানীর মধ্যেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আসল কুরবানীর উদ্দেশ্যও সফল করতে পারবে। এছাড়া কেউ যদি গালভরা কথা ইত্যাদি দ্বারা তা' বোঝাতে চেষ্টা করেন, সেটা আমার বুদ্ধিতে বোঝা বেশ কষ্টকর হ'বে।

দৈনিক আজাদ
২৭. ১১. ৭৭

আসল কথা হচ্ছে মানুষকে আল্লাহ্ যখন ফেরেশতা করেন নি, বরং ফেরেশতা বর্তমান থাকতেই মানুষকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন, তখন মানুষ যে মানুষের দোষগুণ নিয়ে জন্মাবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই।

ধরতে গেলে মানুষের দোষ বলে কোন জিনিস নেই। আবার গুণ বলেও কোন জিনিস নেই। সব দোষকে মানুষ গুণে পরিণত করতে পারে, আবার সব গুণকে মানুষ দোষে পরিণত করতে পারে।

ধরুন একটা লোকের এই প্রবৃত্তি রয়েছে যে, কাজ করতে তার মন চায় না, সে বাড়ী বাড়ী গিয়ে অনুগ্রহ যাচ্ঞা করে রুজি-রোজগার করতে পছন্দ করে। এই প্রবৃত্তি ভালো এবং মন্দ দুই-ই হতে পারে। ঐ লোকটি যদি ভিক্ষে করে জীবিকা অর্জন করতে চায়, তা হলে তার এই প্রবৃত্তি নিঃসন্দেহে মন্দ। আর যদি তিনি কোন বীমা কোম্পানীর কিংবা অন্য কোন সংস্থার ভ্রমণকারী প্রতিনিধি হন এবং ঘরে ঘরে গিয়ে যাচ্ঞা করে কাজ সংগ্রহ করেন তা হলে তাঁর এই জীবিকা অর্জন নিঃসন্দেহে শুধু যে ভালো তাই নয়; সমাজের জন্যে কল্যাণকরও। তাঁর নিজের স্বার্থসিদ্ধির যে প্রচেষ্টা, সেটা দেশের স্বার্থসিদ্ধির মধ্যেই গোণা যাবে।

আবার দেখুন, আমরা যখন ফকিরকে ভিক্ষা দিয়ে মনে করি যে, এটা তার উপকারের জন্যেই দিলাম। তখন আমাদের মনোবৃত্তির মধ্যে কিছু দোষের থাকে না। কিন্তু সেই আমরা যখন কোন ভ্রমণ-কারী প্রতিনিধিকে কোন অনুগ্রহ করে তেমনি মনে করি তখন সেটা দোষের হয়। কারণ আমাদের নিজের ভালো যে তার সঙ্গে নিহিত রয়েছে, সেটা আমরা বুঝতেই যে সেক্ষেত্রে অক্ষম, শুধু তাই নয়; নিজের গরজেই যে সেটা করা উচিত ছিল, সেটা বোঝার দায়িত্বও আমরা পরিহার করতে চাই।

তবে যে যে কাজই করুন না কেন, যদি উদ্দেশ্যে ভালো হয় এবং সেটা কারও উপকার করে তা হলে তো কথাই নেই, এমন কি যদি ক্ষতি না করে তা হলেও সেটাকে ইবাদত বলেই ধরা হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে নিজের ভালোর জন্যে কাজ করে যেতে বাধা তো নেই-ই ; বরং সেটাকে ইবাদত বলে ধরা হবে। এই হলো ইসলাম।

সুতরাং কাজে পরাঙমুখ না হয়ে কাজ করে যাওয়াই হলো আমাদের আসল কর্তব্য এবং সেটা যদি আমরা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্যে করি তা হলে তা করার যথেষ্ট উদ্দীপনাও পাব। এই ধরনের কাজ খুঁজে বের করাই হবে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। উদ্দীপনার জন্যে সর্বপ্রথম যে উদ্দেশ্য কাজ করে, সে হলো অর্থ লাভ। যদিও কোন কিছুতে আশাতীতভাবে অর্থ লাভের অবকাশ থাকে তাহ'লে সেটাই আমাদেরকে করার জন্যে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রেরণা জোগায়। সেটা কারও ক্ষতি না করে তা যদি আমরা দেখি, তাহলে সেটা কারও উপকার করলো কিনা দেখার প্রয়োজন নেই ; কারণ জান্তে কিংবা অজান্তে সেটা অন্যের উপকার করবেই।

আমি একটি উদাহরণ দিলে বুঝতে পারবেন। বছর তিনেক আগে আমি আমাদেরই গ্রামে যাই, আমলা-গোমস্তাদের উপর চটেমটেই যাই। তারা আমাদের জমি-জমার ফসল খেয়ে সর্বনাশ করছিল। আমার নিজস্ব দশ-পনের একর ধানি জমির ফসলের বাবদ মাত্র হাজার দু'য়েক টাকা করে বছরে দিচ্ছিল। গ্রামে গিয়ে, বলা যেতে পারে আমার চক্ষু খুলে চড়ক গাছ হয়ে গেল। মানে সাংঘাতিক কাণ্ড দেখলাম। যারা চাষ করে, না আছে তাদের ঠিকমত লাঙ্গল-গরু ; না পারে তারা ঠিকমত বীজ বপন করতে। বীজেরও এমনি অভাব তাদের ; এর আগে এমনটি আর দেখিনি।

এর প্রেক্ষিতে কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। কলকাতায় আমার বাসায় আমার দেশের একটি ছোকরা কাজ করত। আমি তাকে কিছু লেখাপড়াও শিখাই। এবং আমাদের এখানে থাকায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে কি জিনিস, তার মনে তার পরিচয় ঘটে। আমার বাসার কাজ ছেড়ে সে পুলিশের কনেস্টবল হয়। তারপর বেশ কিছু সঞ্চয় করে সে একর দুই জমি করে। সেই সময় আমি একবার বাড়ী যাই। গিয়ে দেখি, সে তার জমিতে নদী থেকে পাম্প

করে পানি দিয়ে বর্ষা আসার আগে প্রতি বছর দুটো করে ইরিধানের ফসল ফলাচ্ছিল। বছরে প্রায় আড়াইশো-তিনশো মণ ধান পাচ্ছিল, খরচ বাদে বছরে প্রায় সেই সস্তার দিনেও ধান বেচে কমপক্ষে সাত-আট হাজার টাকা করে মুনাফা করছিল।

কিন্তু সম্ভ্রান্ত হওয়ার লোভে ইউনিয়ন পরিষদের ইলেকশন করার জন্যে বেশ কয়েক হাজার টাকা ব্যয় করে এবং ইলেকশনে ফেল করে সর্বস্ব খুইয়ে আবার যে কে সেই হয়ে গিয়েছিল।

সেই এসে আমাকে একটা হিসেব দেখাল। আমি যদি দেশে গিয়ে থাকি এবং সে যে রকম ইরিধান করেছিল সেইভাবে শুধু নীচু জমিগুলিতে, যে জমিগুলির ফসল প্রায়ই বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ডুবে নষ্ট হয়ে যায়, সে গুলোতে অগভীর নলকূপ দিয়ে পানি সেচ করে আগের বর্ষার পানি টানার সময় থেকে পরের বর্ষার বন্যা আসার আগে দুটো ফসল করি তা হলে আমাদের বিলের জমিগুলো থেকেই একর প্রতি বছরে দু'বার ক'রে অন্ততঃ দেড়শো মণ ধান পেতে পারি। যার দাম এ বাজারে প্রায় বার হাজার টাকা। যদি খরচ বাবদ একর প্রতি চার হাজার টাকাও যায় তবুও একর প্রতি আট হাজার টাকা লাভ। এবং এই আট হাজার টাকা থেকে যদি আমার লাভের জন্য দু'হাজার টাকাও নিই এবং বাদ বাকী ছ' হাজার টাকা আমি ও যে কৃষক আমার সঙ্গে কাজ করবে তাদের মধ্যে বণ্টন করে নিই তা হলেও একর প্রতি তারাও তিন হাজার টাকা করে পাবে, যা' তাদের যেমন কল্পনার অতীত হবে, তেমনি আমার পাওনাও আমার আশা-তীত হবে।

আমি বহু লোককে নিয়ে নীচের সেই সরেজমিনে গেলাম। সবাই ঐ একই কথা বললো। একর দশেক জমিতে চাষ করতে পাম্প, লাংগল, গরু ইত্যাদি বাবদ যে টাকা লাগবে সেটা আমার আছে। এবং বুঝতে পারেন যদি আমি শুধু নিজ স্বার্থ উদ্ধারের জন্যেও টাকা লাগিয়ে কাজ শুরু করি তা হলে তা দেশের লোকদের পক্ষেও কত বড় রকমের একটা অবস্থা পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

আমি এসে আমাদের পরিবারের সবার সঙ্গে এটা আলোচনা করি। এবং তারা সাগ্রহে এটা গ্রহণ করে। আমাদের সমগ্র পরিবারের মধ্যে প্রায় তিনশো একর জমি রয়েছে। আমরা যদি ঐ ধরনের কাজ করি

তা হলে কৃষকগণের ও আমাদের উভয়ের স্বার্থ যে কল্পনাতীতভাবে হাসিল হতে পারে তাই শুধু নয়; আমরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে অধিকতর নিকটবর্তীও হতে পারি; এটা যদিও আমরা বুঝি, তবুও যেহেতু আমরা বাঙালী, ঝুঁকি এবং এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে স্বভাবতঃই বিমুখ, এবং আরামের সঙ্গে ঢাকায় নিজ নিজ বাড়ীতে অন্য ধরনের কাজ করে কোনমতে সুখে রয়েছি সেহেতু আমাদের সত্বর কিছু করার তেমন চাড় নেই। তবে মুখে বলছি, 'ইন্‌শাআল্লাহ্‌, অদূর ভবিষ্যতে এটা করবো।'

আপনারা যারা এটা পড়ছেন তাদেরও অনেকের এই দশা। এ ধরনের কাজ, যেটা নিজের স্বার্থসিদ্ধির মধ্যে দেশের ও দশের পক্ষেও যে উপকার করার মওকা দেয়, সে মওকা আপনার সৃষ্টি করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মত চুপ করে রয়েছেন। আল্লাহ্‌ আমাদেরকে সহজে ছাড়বেন না, মনে রাখবেন।

দৈনিক আজাদ
২৩. ১. ৭৭

কোনখানে যে কোন অছিলায় রায়ট লাগুক না কেন, দেখা যায় সংখ্যালঘুদের উপরই সংখ্যগুরুদের দ্বারা সেটা সাধারণতঃ সংঘটিত হয়। এবং সংখ্যালঘুগণ নিজেদেরকে রক্ষা করার যে প্রচেষ্টা করে, তাতে সংখ্যাগুরুদের উপর যতটুকু আঘাত করে সেটাও সংখ্যাগুরুদের সহ্য হয় না, এবং তারা আবার জোরালোভাবে প্রতিআঘাত করে তাদেরকে শিক্ষা দিতে চায়; আবার সংখ্যালঘুগণও প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এমনিভাবে কিছুকাল সেটা দূষিত চক্রে চলতে থাকে।

রায়ট ধর্ম নিয়ে লাগাটা আমরা বেশী দেখেছি বলে আমরা রায়ট বলতে ধর্মীয় রায়টই বেশী বুঝি, নইলে রায়ট হরেক রকম সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু সমস্যা নিয়েই ঘটে। তবে যা' নিয়েই ঘটুক, সংখ্যাগুরুই এর সূচনা করে। একজন শক্তিমান লোক ও একটি দুর্বল লোক একত্রে থাকলে যেমন মারামারির প্রবৃত্তিটা শক্তিমান ব্যক্তিরই থাকে বেশী, তেমনি রায়টের প্রবৃত্তিটা সংখ্যাগুরুরই থাকে বেশী।

ইদানিং ভারতে বিভিন্ন জায়গায় সংখ্যাগুরুদের দ্বারা যে রায়ট সংঘটিত হলো, সেটা ধর্মীয় রায়ট ঠিক ছিল না, কারণ সেটা হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চ ও নীচ গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের মধ্যে ঘটেছিল। তা' হ'লেও কিন্তু সংখ্যালঘুদের উপরই ঘটেছিল।

আবার এখন শ্রীলঙ্কায় যেটা ঘটছে, সেটাও তাই। সেটা তো স্রেফ রাজনীতির রায়ট। ভোট দেওয়া নিয়ে। বাঙলাদেশে স্বাধীনতার পর যে পরিস্থিতি চলছিল, সেটা যদি আরো চলতো তা'হ'লে একটা রায়ট লাগা বিচিত্র ছিল না; কিন্তু কি ধরনের রায়ট লাগতে পারতো তা ধারণা করা না গেলেও, সেটা যে সাম্প্রদায়িক হতো না, সে সম্বন্ধে সবাই নিশ্চিত ছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌র মরযীতে সে পরিস্থিতির অবসান ঘটেছে। এবং হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ আল্লাহ্‌র রহমে এমন ভালো

হয়েছে যে, আমার ছোটবেলা থেকে এ পর্যন্ত আমি এমন নিরবচ্ছিন্ন ভালো সম্বন্ধ দেখিনি।

কিন্তু এই অঞ্চলেই, বাঙলাদেশ ও পশ্চিম বাঙলায়, দেশ বিভাগের পূর্বে যে রায়ট লেগে থাকতো আল্লাহ্‌র মরযীতে চিরকালের জন্যে তার অবসান ঘটেছে ধরে নিলেও সেগুলোর কিছু তিক্ত ও মধুর স্মৃতি আজকার দিনে আমাদের মনকে মাঝে মাঝে আলোড়িত করে। তিক্ত স্মৃতি তো ধরতে গেলে সবটাই। এবং সেটা সার্বজনীন হয়; কিন্তু মধুর স্মৃতি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ঘটে, এবং সেটা বোধহয় চিরকালের জন্যে মনে স্মরণীয় হয়ে থাকে।

১৯৪৭ সালের প্রথমদিকে, কলকাতায় 'গ্রেট রায়ট' হওয়ার আগে, ঢাকায় মারাত্মকভাবে যে রায়ট হয়েছিল, তার একটি ঘটনা মধুর স্মৃতি হয়ে আজো আমার মনে মধ্যে মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সে কথাটা আজ বলবো।

জীবনকে সর্বস্ব করে মুসলমান হওয়াটা, অনুষ্ঠানকে সর্বস্ব করে মুসলমান হওয়ার চাইতে অনেক কঠিন মনে করি। ধরুন নামায, রোযা এ দু'টি আনুষ্ঠানিকভাবে করাটা, যারা করেন তাদের কাছে কিছুই কঠিন নয়। কারণ এতে তাঁরা এতদূর অভ্যস্ত হয়ে যান যে, না করাটাই বরং অস্বস্তি আনে। যাকাতের টাকাও ঠিক করে ধরে, সেটা দান করে, 'পরে মাফ করো'; বলে অব্যাহতি পাওয়াটাও তেমনি সহজ।

কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে মুসলমানের ছোটখাট কর্তব্য কুরআন-হাদীসের আলোকে করে যাওয়াটা বড় কঠিন মনে হয়। ১৯৪৭ সালের ঐ সময়ের আমার একটা কাজ থেকে আমি তা বুঝাতে পেরেছি। ইসলামে রয়েছে, 'যে পর্যন্ত আমার কোন প্রতিবেশী উপোস থাকে সে পর্যন্ত আমার খাওয়াটা মোনাসেব হবে না।' আমি প্রথমে যখন কলকাতা হাইকোর্টে প্রাকটিস্ করতাম তখন বাসা ছিল বেক বাগান রোডে। সেখানে তখনকার দিনের সমৃদ্ধ অবস্থাপন্ন মুসলমানেরা থাকতেন। পরবর্তীকালে ইউনিভারসিটি ফ্লাটে থাকতাম, আশেপাশে কোন গরীব ছিল না। এখন গুলশানে থাকি, অন্তরে এরা যাই থাকুক, বাইরে কেউ গরীব নেই। কিন্তু ঐ সময়ে ১৯৪৭ সালের প্রথমদিকে আগা মসিহ লেনে থাকতাম। এবং আমার বাসাটার আশেপাশে সব বস্তি ছিল, যার মধ্যে অত্যন্ত দুর্দশাগ্রস্ত গরীবেরা বাস করতো।

সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে খাঁটি মুসলমান হয়ে বাস করতে হ'লে প্রতিবেশীর উপোস থাকা অবস্থাতে আমার খাওয়াটা সমীচীন হ'বে না মনে করে আমার বাড়ীতে একমণ চাল; পনের সের ডাল এবং দশ সের আলু রাখা স্থির করলাম। এবং পাড়া-প্রতিবেশীকে জানিয়ে দিলাম যে, তাদের মধ্যে যদি কারও উপোস থাকার মত অবস্থা হয় তা হলে যেন চাল, ডাল এবং আলু আমার এখান থেকে নিয়ে যায়। প্রথমে একটু দ্বিধার সঙ্গে, পরে সচ্ছলভাবে যারা উপোসের সম্মুখীন হতো, তারা নিয়ে যেত।

এবং আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করতাম; মাসে বড়জোর পনের সের চাল এবং ঐ অনুপাতে ডাল ও আলু খরচ হতো। কিন্তু আমি রাত্রিতে যখন খেতাম তখন এমন তৃপ্তির সঙ্গে খেতাম যে আজ পর্যন্ত তা' ভুলতে পারিনি। কিন্তু ইসলামের আসল গুণ যা ওর মধ্যে রয়েছে তা' বুঝলাম পরে। আমার সঙ্গে আমার মহল্লার লোকের আলাপ খুবই কম হতো। কিন্তু আমি অনুভব করতাম, তারা আমাকে সর্বান্তকরণে ভালবাসতে শুরু করেছিল। হঠাৎ কাজ না পেলে উপোস করে থাকতে হবে না; এই স্বস্তিই হয় তো ছিল ঐ ভালবাসার উৎস। এবং এই ভালবাসা যে কত গভীর ছিল তা' বুঝা গেল উল্লিখিত রায়টের সময়।

আগা মসিহতে মুখাজ্জি ভিলায় থাকতাম আমি। তার উল্টো দিকে থাকতেন মিঃ বিশ্বাস বলে এক হিন্দু ভদ্রলোক। তার মেয়ে বেবী আই. এ. পড়তো। আমার মেয়ে তখন বছর দুই বয়সের, তাকে ফুপু বলতো। এবং সেই ওকে লালন পালন করতো। তারা আমাদের সঙ্গে এত অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিল যে, পাড়ার লোকেরা তাদেরকে আমাদের আত্মীয় হলে যে রকম সম্মান করার কথা, সেই রকম সম্মানই করতো।

এর মধ্যে ১৯৪৭-এর রায়ট লাগলো। ঢাকাতেই প্রথমে জোর-দারভাবে সে রায়ট লাগলো। এবং তা' মারাত্মক হওয়ার এমন আভাস পাওয়া গেল যে, দেখতে দেখতে কায়েতটুলি—যে স্থানকে হিন্দুর কেল্লা বলা যেত, হিন্দুশূন্য হয়ে পড়লো। বেবীদের যাওয়ার কোন স্থান ছিল না। তার বাবা মিঃ বিশ্বাস সম্ভবত পশ্চিম বাংলার লোক ছিলেন। চাকরিতে বদলি হয়ে এসেছিলেন। বস্তির এরা এগিয়ে

এলো, বললো "হুযুর আপনার বোনের লাইগ্যা চিন্তা করবেন না, আমরা থাকতে তাদের কোন ভয় নাই।" ভয় সত্যিই থাকলো না। দেখলাম তাদের জন্যে তারা পাহারার বন্দোবস্ত করলো। শুধু তাই নয়, নাজিরা-বাজারওয়ালাদের সঙ্গেও প্যাক্ট করলো আমার বোনদেরকে তারাও প্রটেক্শন দেবে। এরা সবাই ছিলো সেই সব ব্যক্তি, যারা রায়টের অগ্রে থাকতো।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে লাগলো। শেষে একদিন ওরা এসে বললো, ঐদিন সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটবে। সবাই বলেছে, যদি ঐদিনের মধ্যেই তারা চলে না যান, তবে বংশালের ওরা এসে যাবে, তখন আর রক্ষা থাকবে না। তখন এমন অবস্থা যে আগা মসিহ থেকে বেরিয়ে কোন হিন্দুর হিন্দু এলাকায়, ওয়ারী কি নবাবপুরে, যাওয়া অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আমাকে চিন্তিত দেখে তারা বললো, বংশালের ওদের সঙ্গেই শুধু নয়, নবাবপুর ও ওয়ারীর ওদের সঙ্গেও স্থির হয়েছে যে, বেবীদেরকে তারা পার করে দিতে ও নিতে সাহায্য করবে। তখন বিকেল চারটা বাজে। এরাই একটা বাস নিয়ে এলো। বাসে মাল-পত্র তোলা হতে লাগলো । আর বেবী আমার মেয়েটিকে কোলে করে কি কান্না! তার কষ্ট বুঝছিলাম, সে সারাদিন প্রায় ওকে নিয়ে কাটাতো। যখন তারা বাসে ওঠে, তখন ওদিকে বেবীর কান্না এদিকে আমার মেয়ের কান্না আমাকে এতদূর অভিভূত করে ফেলেছিল, যে আমার চোখও শুকনো ছিল না। হঠাৎ দেখি আমার আশে পাশে যারা ওদেরকে তুলে দিচ্ছিল, যারা এই সব রায়টে অগ্রগামী ছিল, চোখ মুছছে আর ওদেরকে তুলছে। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করায় কথা বলতে পারছিল না, পাছে কেঁদে ফেলে! আমি এ দৃশ্য কখনো দেখিনি, এবং কখনো দেখবো মনে করিনি।

তারা চলে গেল, ওরা তাদেরকে সহি-সালামতে পৌঁছে দিতে সঙ্গে গেল। পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে আমাকে খবর দিল।

সেই রাত্রিতে সারা ঢাকা ভেঙে পড়লো, 'আল্লাহু আকবার' ও 'বন্দে মাতরম' ধ্বনিতে। আমি শিউরে উঠে শুধু ভাবছিলাম এরা যদি অত আগ্রহভরে ওদেরকে পৌঁছে না দিয়ে আসতো তবে কি কু-কাণ্ডই না ঘটতে পারতো! আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে গিয়ে বার বার মনে হচ্ছিল, আমি মুসলমান হিসেবে তাদেরকে প্রতি বেলায়

খাওয়ার সময় যে মনে রাখতাম তারই বদলা হিসেবে আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছিলেন, তারই বদলা হিসেবে যারা রায়ট করে তাদের মনেও যে কতদূর সহানুভূতি থাকতে পারে তা' দেখিয়েছিলেন, তারই বদলা হিসেবে এমন'দৃশ্য দেখিয়েছিলেন, যা আজও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। কুরআনে সূরা নিসায়ে এবং হাদীসে প্রতিবেশীদেরকে ভালবাসার যে নির্দেশ এসেছে তার মধ্যে একই রকম, অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও যে স্থান রয়েছে তার জন্যে। যদিও আত্মীয় ও মুসলমান হলে, এই ভালবাসায় তার অধিকার বেশী থাকে, কিন্তু তাদের কেউ প্রতিবেশী না হলে অমুসলমান প্রতিবেশী-দের অধিকার বহুক্ষেত্রে তাদেরকেও ছাড়িয়ে যায়।

কিন্তু জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা সম্বন্ধে এই ভালবাসার কোন ভেদাভেদ নাই, কারণ হযরত মুহম্মদ (সাঃ) বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সেই লোক শ্রেষ্ঠ, যার কাছ থেকে প্রতিবেশী ভাল আশা করে এবং সেটা পায়, এবং মন্দ থেকে বাঁচাবে বলে আশা করে, এবং সে বাঁচায়।"

সুতরাং বেবীদের যে সাহায্য আমরা সবাই মিলে করেছিলাম তা ব্যক্তিগতভাবে করলেও কুরআন এবং হাদীসের অনুশাসন অনুসারেই যে তা হয়েছিল, এটা আজও আমাকে পরম তৃপ্তি দান করে। শুকর আলহামদুলিল্লাহ্।

দৈনিক আজাদ
২৮. ৮. ৭৭

টেলিভিশনে অনেকদিন আগে One step beyond শিরোনামে কিছু ছবি দেখান হতো, তাতে সত্য গল্প দিয়ে দেখান হতো যে, মানুষের অবচেতন মনে অনেক সময় এমন কিছু দেখা যায়, কিংবা অনুভব করা যায়, যা পরবর্তীকালে দেখা যায় ঘটে গেল। এর কোন বৈজ্ঞানিক কারণ অবশ্য নেই, তবে এ ঘটাটা অবৈজ্ঞানিকও কিছু নয়; সেই জন্যেই 'ছায়া পূর্বগামিনী' ধরনের কিংবা Wishful thinking ধরনের কথা ভাষায় সৃষ্ট হয়েছে। এবং সৃষ্ট হয়েছে ঐসব ক্ষেত্রের জন্যে, যেখানে মানুষের চিন্তাধারা কোন কিছুকে আশ্রয় করে তার মনে বিশ্বাসের একটা প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে, এবং অতীতের কিছু কিছু ঘটনায় সেদিকে অগ্রসর করে নিয়ে যায়। এবং এ বিশ্বাস যদি ধর্মভিত্তিক হয়, তা হ'লে স্পষ্টভাবে ভবিষ্যতের একটা ছবিও দেখা যেতে পারে।

ঠিক এই ধরনের বিশ্বাসভিত্তিক চিন্তাধারায় অনেকদিন থেকে বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে যে কথাটা আমার মনে হয়েছে সেটা শবেবরাত সামনে রেখে আজ বলেই ফেলতে চাই। সেটা হলো বাংলা-দেশের ভবিষ্যত এত উজ্জ্বল যে আমরা এই মুহূর্তে কল্পনাও করতে পারি না। এবং সেটা দশ বছরের মধ্যেই আমরা অনুভব করবো। কথাটা স্রেফ ধর্ম ও বিশ্বাসভিত্তিক হলেও কার্য-কারণপরম্পরা বুদ্ধি দিয়ে প্রত্যাশা করার মত বলেই বলছি। আল্লাহ্ মুসলিম জাতিসমূহের উপর সর্বাপেক্ষা বেশী মেহেরবান, এ কথা কুরআন-হাদীসে বহুবার উল্লেখিত হয়েছে এবং মুসলিম জাতির ইতিহাসেও তা প্রমাণিত হয়েছে। নইলে ধরুন Holy Roman Empire পৃথিবীর যতটুকু জায়গায় বিস্তৃত হ'তে আটশো বছর প্রায় লেগেছিল, সেখানে মুসলমানদের লেগেছিল মাত্র একশো বছরের মত। এটা আমি বহু পূর্বে লব্ধজ্ঞান হ'তে বলছি; তথ্যের কিছু তারতম্য হলেও মোটামুটি ঐ ধরনের একটা সত্য সৃষ্ট হওয়ার মত। যুগে যুগে মুসলমানদের

এই সমৃদ্ধি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল, তেমনি শেষ হয়ে গিয়েছিলও এমন করে যে, আমাদের ছোটবেলায় তার জন্যে খুবই আফসোস শুধু নয়; বেদনাও হতো। এটাও আল্লাহ্ কুরআনের অন্য একটি বাণীর সত্যতা প্রমাণের জন্যে করলেন, সেটা হলো 'যে জাতি তার উন্নতির জন্যে যতটা চেষ্টা করবে সে ততটা ফল লাভ করবে।' আমাদের ছোটবেলায় আমরা দেখলাম ইসলাম ডাহা ফেল করেছে। কোন অঞ্চলে উন্নত হওয়ার কোন চেষ্টাই নেই। ভারতে হিন্দু রাজত্ব, অন্যত্র অন্য রাজত্ব।

সব মিলে এমন একটা টিমটিমে অবস্থা যে একেবারে আশাহীন হয়ে পড়লাম। বিশ্বে সব জায়গাতেই প্রতিযোগিতায় মুসলিম টিকছিল না। এবং প্রতিযোগিতার সর্বনাশা যে তাছির হয় তা হলো এই যে, প্রতিযোগিতায় টিকতে না পারলে মেরুদণ্ড এমন ভেঙে যায় যে, আবার কোমর বেঁধে লাগবে, সে বল থাকে না। বাইরের মুসলিম দেশগুলো অন্য জাতির সঙ্গে যেমন টিকতে পারছিল না; তেমনি ভারতবর্ষের মুসলমানগণও হিন্দুর সঙ্গে টিকতে পারছিল না। এবং এই অবস্থা ভাগ্যিস তাদের হয়েছিল যার জন্যে কুরআন ও হাদীসের বাণী যে, 'আল্লাহ্ মুসলমানদের উপর মেহেরবান,' তা' সার্থক হলো। তিনি মুসলিম দেশগুলোর মাটি ফুঁড়ে এত তেল দিয়ে দিলেন যে, বিনাক্লেশে নগণ্য দৃষ্টিতে দেখার মত দেশগুলো, এই অল্প কিছুদিনের মধ্যে এত সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিসম্পন্ন হয়েছে যা মুসলমানদের প্রথম দিকের উন্নতির শুরু হওয়ার সঙ্গে তুলিত হ'তে পারে। এবং যে-সব কারণ মুসলিম জাহানের অবক্ষয় এনেছিল, তার মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল তাদের বিভিন্ন দেশের রেষারেষি ও ঐক্যের অভাব। এখন সৌভাগ্যবশত তার উল্টো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, এবং সেটা দেখা যাচ্ছে একটি আপাত-দুর্ভাগ্যের জন্যে, অর্থাৎ ইসরাইলী হামলার জন্যে। সুতরাং আল্লাহ্ যে কোন্ দিক দিয়ে আমাদের হিত আনেন তা' আমরা বলতে পারি না। তবে এটা ঠিক উন্নতির একটা Starting point-এ আল্লাহ্ মুসলমানদেরকে এনে দিয়েছেন, যেমন দিয়েছিলেন রাশিয়াকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এবং চায়নাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে। সুতরাং মুসলিম জাহান কতদূর উঠতে পারে তা বর্তমানে কল্পনার অতীত হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ এ পরিস্থিতি কল্পনার অতীতভাবেই আল্লাহ্ তাদেরকে দিয়েছেন।

এখন বাংলাদেশের কথায় আসা যাক। বাংলাদেশের মুসলমান, আমার বিশ্বাসমতে, সব চাইতে খাঁটি; যদি না তাকে লোভ স্পর্শ করে। লোভ স্পর্শ করলে তাদের মধ্যে মীরজাফর পাওয়াও কঠিন হয় না। সে কথা আর একদিন বলবো। আজ শুধু এইটুকু বলবো যে, আল্লাহ্ তাদের প্রতি মেহেরবান ছিলেন; এবং এখনও রয়েছেন বোঝা যাচ্ছে। কি করে? বলছি।

পাকিস্তান যে হয়েছিল, সেটা যে শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশ হওয়ার জন্যে আল্লাহ্ করেছিলেন তা আমরা তখন বুঝতে পারি নি। কারণ, জিনিসটা ঐকিক নিয়মে দুই ধাপে করার জন্যে আল্লাহ্‌র ইঙ্গিত ছিল। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাকিস্তান, পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ। আদি পরিকল্পনায় যে পাকিস্তান ছিল, তার মধ্যে বাংলাদেশের স্থান ছিল না। পাকিস্তানের পরিকল্পনার মধ্যে বাংলাদেশ না থাকলে বাংলাদেশ ভারতের অংশ হয়ে যেত এবং ভারতে মুসলমানদের বর্তমান যে অবস্থা, এদেরও তাই হতো। সুতরাং এটা আল্লাহ্‌র ইঙ্গিত বলে ধরি যে, পাকিস্তান পরিকল্পনায় বাংলাদেশ এসেছিল। আবার দেখুন পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরা এমন আচরণ করা শুরু করলো যে, যেসব বাংলাদেশী মুসলমান পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার জন্য কোন না কোন কাজ করেছে, তারা 'পাকিস্তান টিকে থাকুক', এ চাওয়া সত্ত্বেও মনে মনে বিতৃষ্ণ হয়ে উঠলো। এবং শেষ পর্যন্ত যখন বাংলাদেশ কর্তৃত্ব করার শক্তি পেল তখনই, মানে ঠিক উল্টো সময় পশ্চিমীরা এমন অত্যাচার শুরু করলো যে, স্বাধীনতা ছাড়া বাংলাদেশীদের গত্যন্তর থাকলো না।

এই যে আমি 'উল্টো সময়' বললাম, এটা বললাম এই জন্যে যে, আদিতে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এবং অবস্থাপন্ন লোকেরা আমাদের এত হেয় চক্ষে দেখতো যে শেষের দিকের সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সুতরাং তখন না ভেঙে এমন সময় ভাঙলো যে, যখন বাংলাদেশের প্রতিপত্তির সত্যিকার সূত্রপাত হয়েছিল। এর মধ্যে আর একটা ইঙ্গিত এই বলে ধরা যায় যে, আল্লাহ্ চেয়েছিলেন এই পঁচিশ বছরে এমন একটা অবস্থা যেন বাংলাদেশের হয়, যাতে করে স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। রাস্তা-ঘাট, কল-কারখানা, ব্যাংক ইত্যাদি যখন খুব চালু, তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছেয় এটা ঘটলো। পাঁচ-ছ'বছরের মধ্যে এই

স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘটতো যখন পণ্ডিত নেহেরুর কর্তৃত্ব ছিল, এবং তার সঙ্গে প্যাটেল ছিলেন, তখন তারা বাংলাদেশে এসে আর ফিরে যে যেতেন, আমার মনে হয় না। তা' ছাড়া স্বাধীনতার পরে যে সব কাণ্ড ঘটেছিল তা' যদি চিন্তা করেন, তাহলে বৃহত্তর বাংলার ধূয়াতেই আবার আমরা মারা পড়তাম। সুতরাং আল্লাহ্‌র শুকুর যে পঁচিশ বৎসর পরে এই সংগ্রাম ঘটলো। ঠিক যখন পরিপক্ক সময়, তখন। আবার আল্লাহ্‌র মেহেরবানী দেখুন, যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এত ক্ষমতালোভী, এখন দেখা যাচ্ছে, তিনি কল্পনাতীতভাবে উদার হয়ে গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সর্বপ্রথমে মেনে নিয়েছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আল্লাহ্ যদি সব মুসলিম রাষ্ট্র এক হয়ে থাকুক এই চান, তা' হ'লে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেল, কেন? এর উত্তর ঐ যে আমি বলেছি অবচেতন মনে ছায়া পূর্বগামিনী কিংবা Wishful thinking যাই বলুন তার প্রেক্ষিতে দিতে চাই। এটা আল্লাহ্ চেয়েছেন এই জন্যে যে, ইনশাআল্লাহ্ আমরা তেল পাব! কারণ, পাকিস্তান থাকা অবস্থায় যদি তেল পেতাম তা'হলে তা' এক্সপ্লয়েট করে ওদের শক্তি ও সামর্থ্য এত বেশী হতো যে তখন ছুটে যাওয়া কঠিন হতো। তা' ছাড়া আমাদের এদের তুলনায় অনেক কম হলেও অবস্থা এতটা ভাল হতো যাতে করে অর্থনীতির দুর্দশা কিছুটা কমে যাওয়ায় তা' স্বাধীনতার সংগ্রামকে অতটা জোরদার করতে পারতো না। এবং আমরা চিরকাল শোষিত হতাম।

যে কথাগুলো আজ বললাম, আজ লিখে বললাম; কিন্তু এ কথা গুলো ১৯৭৪ সালে আমার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিল, মোমেন, এই যে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি, আর যা' ঘটছে, তার কি হ'বে? এর থেকে কি দেশ রেহাই পাবে না? তখন আমি তাকে হুবহু যা এখন বললাম, তা বলে বলেছিলাম; যে দু-তিন বছরের মধ্যে, আমি ঠিক যেমন বললাম ধর্ম-ভিত্তিতে বিশ্বাস করি, ঠিক সেই বিশ্বাসে বলেছি শাসনের অবস্থা পরিবর্তিত হবে, ভাল দিন আসবে; এখন পর্যন্ত তেল পাই নি সেটা ঠিক। কিন্তু যে বিশ্বাসে বলেছিলাম শাসনের অবস্থা পরিবর্তিত হবে, সেটা বাংলাদেশের উপর আল্লাহ্‌র যে মেহেরবানী রয়েছে, সেটা উল্লেখ করেই বলেছিলাম। এবং আপনারা জানেন যে, অবস্থার পরিবর্তন দু'বছরের মধ্যেই হয়েছে এবং ভালো দিনও এসেছে বলে মনে হয়।

এ কথাটা আমার বন্ধুকে দু'বছর আগে হাউস রেন্ট ট্যাক্স কমিশনারের অফিসে কথায় কথায় তার সামনেই বলছিলাম, এবং আমার সে বন্ধুও আমার এই বিশ্বাসকে অনেকটা গ্রহণযোগ্য মনে করেছিল বলে আজকে শবেবরাতে এটা আপনাদের উপহার দিলাম।

এবং সেই বন্ধুটির মতের দাম দিচ্ছি এই জন্যে যে, সে যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়, তা হ'লেও আমি আশ্চর্য হবো না। কারণ সে এক সময়ে মুখ্যমন্ত্রী ছিল।

এই তেল পাওয়ার কথাটা আপাতত একটা কঠিন বিশ্বাসের কথা বলে দ্বিধার সঙ্গে ঐভাবে বললাম। নইলে বাংলাদেশের ভবিষ্যত যে অন্য ধরনেও উজ্জ্বল সে সম্বন্ধে আমি নির্দ্বিধায় আগেও কিছু বলেছি, ভবিষ্যতে বিস্তারিতভাবে বলবো, ইনশাআল্লাহ্।

দৈনিক আজাদ
৩১. ৭. ৭৭

বেশ কিছুকাল ধরে আমাকে দেশে যে সব ধরনে লোক মারা যাচ্ছে, তাতে মৃত্যু তার ধারাবাহিকতা ঠিক হারিয়ে না ফেললেও কিছুটা যেন ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে হচ্ছে।

অর্থাৎ "কুল্লু নাফসিন যায়েকাতুল মাউত" 'প্রত্যেককে মৃত্যু আস্বাদন করবে'—এটা ঠিক থাকলেও মানুষের সেই মৃত্যু আস্বাদনের ধরনটা যেন ঠিক প্রত্যাশিতভাবে হচ্ছে না, হচ্ছে না যিনি মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছেন তাঁর কাছে, না হচ্ছে যাঁরা দেখছেন তাঁদের কাজে। এসব মৃত্যু তিন পর্যায়ে ঘটে, ধরা যেতে পারে।

প্রথম পর্যায়ে ধরা যায় সেই মৃত্যু, যে মৃত্যু তখন ঘটে, যখন আমরা তা প্রত্যাশা করি না; দ্বিতীয় পর্যায়ে যে অবস্থায় ঘটে, সে অবস্থায় আমরা সে মৃত্যু কল্পনা করতে পারি না। কিংবা তৃতীয় পর্যায়ে, যার ক্ষেত্রে ঘটে, তার ক্ষেত্রে আমরা তা' চাই না। এবং এই জন্যেই শুধু আমাদের কাছে ব্যতিক্রমধর্মী বলে মনে হয়; যদিও আমাদের চোখের সামনে সে রকম মৃত্যু হরদম ঘটছে।

এবং চোখের সামনে ঘটছে, তবুও সেটা ব্যতিক্রমধর্মী বলে যে মনে হয়, তার একমাত্র কারণ ঐ অনুভূতিটা সম্পূর্ণ তাৎক্ষণিক হয় বলে। ঠিক যেমন গ্রীষ্মকালে পুরাদমে পাখা ছেড়ে খালি গায়ে শুয়ে শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে শোবার কথা চিন্তা করা যায় না, কিংবা শীতকালে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে গ্রীষ্মকালে উদোম গায়ে পূর্ণবেগে পাখা ছেড়ে দিয়ে শোবার কথা কল্পনা করা মুশকিল হয়, এও ঠিক তেমনি। সময়টা পার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিও উবে যায়।

তবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থাকলে তার মাধ্যমে এই ধরনেও অনুভূতির তীক্ষ্ণতা যেমন জীবনে আনা যেতে পারে, ঠিক তেমনি মৃত্যুর চিন্তার ব্যাপারে আল্লাহ্‌র পথে সঠিকভাবে থাকার

প্রস্তুতিও অনেকটা এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের মত জীবন-মৃত্যুর তফাতটা অনেকটা কমিয়ে দিতে পারে। এবং যেমন কোন গৃহের এই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ একেবারে ব্যক্তিগত ব্যবস্থা হয়ে থাকে, মনের ব্যাপারেও তাই। তাই সেটাও যিনি অমনি মনকে প্রস্তুত রাখেন তার জন্যেই সত্য। বাইরের অবস্থা যা, তা তাই থাকে। আবার বাইরের যিনি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ অবস্থান করে তার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষের কিছু হদিস রাখেন, তিনি তাঁর মনেরও ঐ ধরনের নিয়ন্ত্রণের খবর রাখেন। তার বুঝতে কষ্ট হয় না যে, ঐ ব্যক্তির মনে শীত-গ্রীষ্মের মত জীবন ও মৃত্যুর তফাত বেশী নেই।

মৃত্যু সম্বন্ধে মনের এই প্রস্তুতিই বাস্তাবিকভাবে জীবন-মৃত্যুর তফাতটা কমিয়ে আনে। এবং এই প্রস্তুতি যে ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করি বর্তমান রয়েছে, সে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির মৃত্যু আমাদের ততটা অপ্রত্যাশিত মনে হয় না। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে আমার সেজ ভাই হোমিও-প্যাথ ডাক্তার মরহুম নুরুল ওহাবের কথা ধরা যেতে পারে। তিনি জীবন শুরু করার সময় যা কল্পনা করেছিলেন মৃত্যুর পরে তার অনেক বেশী পেয়ে তিনি এমন পরিতৃপ্ত ছিলেন যে, মৃত্যুর ব্যাপারে বলা যায় তাঁর কোন চিন্তাই ছিল না। তিনি হার্টফেল করে মারা যান। এবং এ হার্টফেল হয় তার ফ্যাটি হার্টের জন্যে। তার শরীর এই অসুবিধেটুকু ছাড়া সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। চবি জাতীয় খাদ্য খাওয়াটা কমালে এ অসুবিধে হয়তো থাকতো না, "মৃত্যু আল্লাহ্র হাতে তবে আমাদের পরহেয করে বেঁচে থাকার চেষ্টায় দোষ কি ?" এ কথা বলে যদি তাকে চবিজাতীয় খাওয়া কমাতে বলা হতো তা হলে তিনি তার উত্তরে বলতেন, "আরে মিয়া, মৃত্যু তো আমার তামাদি হয়ে গেছে। হযরত (সাঃ) বেঁচে ছিলেন ৬৩ বৎসর ; যে দিন আমার সে বয়স পার হয়ে গেছে, সেদিনই মৃত্যু আমার তামাদি হয়ে গেছে।"

কথাটা 'লাখ কথার এক কথা' বলা যেতে পারে। তবে তিনি যেভাবে এটা চিন্তা করে বললেন ঠিক সেভাবে নয় ; এর মধ্যে আল্লাহ্র ইচ্ছা মানুষের মধ্যে পূরণের যে ইঙ্গিত রয়েছে সেটা ধরেই এ কথাটার সত্যিকার মূল্য নির্ধারণ করলে তবে হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যু ও হযরত (সাঃ)-এর জীবনের মতই মানব-জীবনের আদর্শ হিসেবে গৃহীত হতে পারে এবং সেই অর্থেই এটা লাখ কথার এক কথা বললাম।

হযরত (সাঃ) যে তেষট্টি বছর বয়সে মারা গেছেন এ তেষট্টি কিন্তু সংখ্যা নির্ধারক নয়; পরিপূর্ণতা নির্ধারক বৎসর। অর্থাৎ যে বাণী তাঁর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ পাক প্রচার করতে চেয়েছিলেন তা চিরন্তন-ভাবে পরিপূর্ণ করার যে অবস্থার সৃষ্ট হয়েছিল সেটা হয়েছিল যখন হযরত (সাঃ)-এর ৬৩ বৎসর বয়স তখন। অর্থাৎ হযরত (সাঃ)-এর ঐ বয়সেই আল্লাহ্ পাক তাঁকে সৃষ্টি করে যে প্রয়োজন মেটাতে চেয়ে-ছিলেন সে প্রয়োজন মিটে গিয়েছিল এবং সেই জন্যেই হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুর প্রায় আড়াই মাস পূর্বে সূরা নাসর নাযিল হয়। এবং এটা বিদায়ী হজের সমসাময়িক। এই সূরায় হযরত (সাঃ)-এর পয়গাম পরিপূর্ণ হওয়ার সুখবর আসে যে, আল্লাহ্ হযরত (সাঃ)-কে যে সাহায্য দান করতে চেয়েছিলেন তা পুরামাত্রায় সার্থকতা এনেছিল; এবং তা হযরত (সাঃ)-এর আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত করেছিল, যার জন্যে তিনি বিদায়ী হজে সকল মুসলমানকে জিজ্ঞাসা করে তাদের জবাব নিয়ে আল্লাহ্র দরগায় বলতে পেরেছিলেন, "হে আল্লাহ্! আপনি শ্রবণ করুন, আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।"

মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র বাণী প্রচারের এই যে সার্থক মুহূর্ত, এটাই ছিল চরম মুহূর্ত। আর সে জন্যেই আল্লাহ্ তাঁকে প্রেরণ করে-ছিলেন এবং এই সার্থকতা আসার পরপরই তাঁকে তুলে নিয়েছিলেন; এবং যে বয়সে তুলে নিয়েছিলেন সেটাই ছিল ঘটনাক্রমে ৬৩ বৎসর। যদি এ পরিপূর্ণ সার্থকতা তার আগে আসতো, তা হলে তার আগেই তাঁকে আল্লাহ্ তুলে নিতে পারতেন, যদি পরে আসতো তা হলে আল্লাহ্ তাঁকে ততদিন বাঁচিয়ে রাখতেনই। কারণ আল্লাহ্ যে তাঁকে এই সার্থকতা দেবেন তার প্রত্যাদেশ হযরত (সাঃ) আগেই পেয়েছিলেন।

সুতরাং হযরত (সাঃ)-এর মৃত্যুর বয়স থেকে আমরা যে সূত্র পাই সেটা অঙ্কের কোন হিসেব নয়; পরিপূর্ণতার হিসাব।

আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টির সেরা 'আশরাফুল মাখলুকাত' করেছেন এই জন্যে যে, তার মধ্যে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি যা তিনি দিয়েছেন নিরলস চেষ্টার দ্বারা তা পূর্ণভাবে বিকশিত করে মানুষের এবং তার মাধ্যমে আল্লাহ্র কাজে সে সেটাকে নিয়োজিত করবে। এবং যখন কেউ দেখে যে, সার্থকভাবে সে তাকে ঐভাবে নিয়োজিত করতে পেরেছে, তখনই তার মৃত্যুর সঠিক সময় বলে ধরা

যায়। মানবের কল্যাণে নিয়োজিত এই উঠতি সময়ে যদি কেউ দেহ-ত্যাগ করে, তা'হলে ধরা যায় তাকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তা পালিত হয়েছে এবং তার মৃত্যুটা তারপক্ষে এবং অন্যের পক্ষেও যতই দুঃখের হোক না কেন; আকাঙ্ক্ষিত। কারণ এই পরিপূর্ণতা লাভের পর যদি তার মন ঘুরে যায় এবং সেটা মানুষের যে কল্যাণ সে এনেছিল তা ব্যাহত করে, তা'হলে তার মৃত্যুও দুঃখের হবে এবং আকাঙ্ক্ষিতও হবে, তবে সেটা হবে ব্যতিক্রমধর্মী মৃত্যু।

অবশ্য প্রথম পর্যায়ের এই ব্যতিক্রমধর্মী মৃত্যু তাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য দেখানো হলো, যাদেরকে আল্লাহ্ বৃহত্তরভাবে সম্পদ ও মানসিকতা দ্বারা দেশের ও দশের কাজে লাগার সামর্থ্য দিয়েছিলেন এবং সে সামর্থ্য তারা কাজে না লাগিয়ে দেশ ও দশকে তা থেকে বঞ্চিত রেখেছিল। কিংবা প্রথমে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীকালে সে কাজকে নস্যাৎ করেছিল; এই অবস্থায় যখন যাদের মৃত্যু ঘটতো সেই মৃত্যুকেই ব্যতিক্রমধর্মী মৃত্যু বলবো। কারণ তারা আল্লাহ্ ও মানুষের প্রত্যাশার ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিল।

বাংলাদেশে এই ধরনের মৃত্যু কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পদশালী ব্যক্তিদের মধ্যে দেখা গেলেও বেশীরভাগই দেখা যায় রাজনীতিক প্রতাপশালী ব্যক্তিদের মধ্যে। এইসব সম্পদশালী ব্যক্তি ব্যবসা ও শিল্প যা করেছেন, তা' করেছেন স্রেফ তাঁদের নিজেদের এবং তাঁদের সন্তান-সন্ততির সংস্থানের জন্যে; এই ব্যবসা ও শিল্প সব কিছুই তাঁরা করতে পারতেন যদি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীতে দশের ও দেশের সেবার দৃষ্টিভঙ্গী থাকতো; তা হলে তাঁদের নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যেমন আসতো, তেমনি আসতো দেশের ও দশেরও। অন্তত বিদেশে নানা রকম কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের বিত্তশালিগণ যে-রকম দান করেন, সেরকম দান করেও এঁরা দেশকে হিতকর কাজে অনেক অগ্রসর করতে পারতেন। এবং যে মুহূর্তে এই দান করতেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর মৃত্যুটা আল্লাহ্র আকাঙ্ক্ষিত রাস্তায় এসে যেতো। সুতরাং তাঁর মৃত্যুকে ব্যতিক্রমধর্মী বলা যেতো না। ডাঃ রাসবিহারী ঘোষের কথা ধরুন, কঞ্জুস বলে তাঁর খুব বদনাম ছিল। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করেছেন, কিন্তু কাউকে একটা পয়সা দিয়ে কখনই সাহায্য করেন নি। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে

প্রায় সতর লক্ষ টাকা—তাঁর জীবনের প্রায় সমস্ত আয় দান করে গিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর মৃত্যুটা ছিল মানুষের সেবার পথে আকাঙ্ক্ষা পূরণের মৃত্যু; সুতরাং ব্যতিক্রমধর্মী ছিল না। পক্ষান্তরে আমাদের মধ্যে এমন অনেক রাজনীতিক নেতাও জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যাঁরা দেশকে এমন এক স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন যে, দেশ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞতায় এত আবদ্ধ হয়েছিল; তাঁরা যদি ঐ সময় মারা যেতেন তবে আল্লাহ্‌র রাস্তায়, মানুষের সেবায় মারা যেতেন বলে তাঁদের স্মৃতি চিরকাল মানুষের মনে কৃতজ্ঞতায় জাজ্বল্যমান থাকতো। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা এর এত ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিলেন যে, তাঁদের ক্ষমতাচ্যুতি কিংবা মৃত্যুতে মানুষ স্বস্তি পেয়েছিল। তাদের ক্ষমতাচ্যুতির মৃত্যু কিংবা সরাসরি মৃত্যু উভয়ত ব্যতিক্রমধর্মী মৃত্যুও বলা যায়।

দৈনিক আজাদ
১৫·১০·৭৮

আলোকজাণ্ডার পোপ বড় কবি ছিলেন এবং খুব ভালো ভালো কথা বলে গেছেন, কিন্তু তিনি রাজনীতির ব্যাপারে দুটো পঙক্তি যেমন অপূর্বভাবে রচনা করে কঠিন একটি সত্য প্রকাশ করে গেছেন ; তেমন কোন রাজনীতিকও করতে পারেন কি ? পঙক্তি দুটো হলো ঃ

For forms of government let fools contest
Whate'er is best administered is best.

বাংলা করলে হয় ঃ

সরকারের ধরন নিয়ে করুক তর্ক যত বোকার দল।
শাসন ভালো যেটার হয়, সেটাই ভালো, একথাই আসল।।

'ইজম' সম্বন্ধেও ঐ একই কথা খাটে। সুতরাং সমাজতন্ত্র বলে একটা সরকার চালানোর চেষ্টা যদি করা যায়, আর তার জন্যে ঠিক উল্টো ফল ফলে তা হলে সেটা আমাদের জন্যে উপযুক্ত বলে প্রত্যাশা করলে সেটা বোকামিই হবে না; হাস্যকরও হবে। সমাজতন্ত্র হাতের তুড়ি দিয়ে যদি ঘটানো যেত তা হলে রাশিয়াতেও সেটা ঘটানোর জন্যে লেনিনের মত লোক প্রয়োজন হতো না। লেনিনের এই জন্যে যে গুণ কাজে লাগাতে হয়েছিল সেটা হলো মানুষের জন্যে তখনকার দিনে কার্লমার্কসের যে সব নীতি রাশিয়াতে সমাজতন্ত্র আনার জন্যে প্রয়োগযোগ্যই শুধু নয়; অতীব কার্যকরী মনে হয়েছিল তার সঠিক জ্ঞান এবং এই জ্ঞান নির্বিবাদে প্রয়োগ করার ক্ষমতা তার ছিল। এবং এই ক্ষমতার স্বরূপ হলো দুর্দান্তভাবে নিজে কাজ করে এবং মানুষের দ্বারা কাজ আদায় করে, এবং তার জন্যে কোন বাধা সহ্য না করে সেটাকে এমনভাবে রাশিয়ার মাটিতে গ্রথিত করা, যাতে তার থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া সুনিশ্চিত হয়।

কার্লমার্কসের সব কিছুই যে প্রয়োগযোগ্য ছিল না, এই জ্ঞানই তার পক্ষে সেই ধরনের সমাজতন্ত্র স্থাপন করা সম্ভব করেছিল যেটা রাশিয়ার পক্ষে সব চাইতে হিতকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

এটা হতেই হবে। কারও সম্পূর্ণ মতবাদ কিংবা কোন এক দেশের সম্পূর্ণ শাসনতন্ত্র অন্য একটি দেশের জন্যে হুবহু গ্রহণ করার মত প্রশস্ত হতেই পারে না।

এটা ঠিকই যে, কোন তন্ত্র—যা সমাজের সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের লোকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে, সেটা যদি তাদের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাঘাত না ঘটায় তা হলে সেটা যেখানেই ঘটুক না কেন, সাদরে গ্রহণযোগ্য এবং কোন দেশের গ্রহণযোগ্য এবং কোন দেশের কোন সরকার সেটা যদি সার্থকতার সঙ্গে ঘটায় তা'হলে সে সরকারও অভিনন্দনযোগ্য।

কিন্তু কথা হচ্ছে, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে তা ঘটছে না। কিংবা সার্থকতার সঙ্গে ঘটছে না। তা যদি না ঘটে তা'হলে উপায়? উপায় এমন একটি সমাজ ব্যবস্থার, যেটা সামগ্রিকভাবে তথাকথিত সমাজ-তন্ত্রের বিকল্প বলে ধরা যেতে পারে।

যেখানে অন্যকে বাদ দিয়ে এক জনকে বড়লোক হওয়ার সুবিধে দেয়, অন্যকে বঞ্চিত করে একজনকে সুখে থাকার অবকাশ সৃষ্টি করে, অন্যকে হীন কিংবা কৃপার চোখে দেখার সুযোগ দান করে; সেখানে এমন একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় যার মাধ্যমে এই অবস্থার নিরসন হতে পারে—এখানে যাকে ইসলামিক সোস্যালিজম বলা হয়; সেটা আসে।

কার্লমার্কসের দর্শন এসেছিল প্রতিবাদ হিসেবে। শিল্প-বিপ্লবের পর ক্যাপিটালিস্টদের পক্ষ থেকে মজুর ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর লোকদের যে শোষণ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রতিকার হিসেবে। এবং সেটা ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রায় তেরশো বছর পর। তার আগে রাজাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতার বল স্বীকৃত হয়েছে বিনা প্রতিবাদে। বড় বড় লর্ড বা ভূ-স্বামীর অধিকার কোন প্রকার খর্ব করার চেষ্টা না করে তা মেনে নিয়ে ইতরজনা সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করেছে। নারীকে সর্ব প্রকার অধিকার থেকে অনায়াসে চ্যুত করা হয়েছে। দানবীর যারা ছিলেন, তারা গরীবের জন্যে হাসপাতাল, স্কুল-কলেজের জন্যে, এমন কি কুকুর-বিড়ালের মঙ্গলের জন্যে যা দান করেছেন তা স্রেফ তাদের নিজস্ব খেয়াল ও সুবিধামতই।

কারণ তাদের সে দান করার জন্যে বাধ্য করার মত কোন আইন-কানুন কিংবা বাধ্য-বাধকতা ছিল না।

যখন অমুসলিম সমাজে প্রায় বারশো বছর ধরে এই অবস্থা চলে আসছিল তখন তার পাশাপাশি ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা চলছিল যেটা ছিল তখনকার দিনে কল্পনাতীত। এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেটা চলছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলছি এই জন্যে যে, স্রেফ মানবতার বোধ তাতে ছিল; তার জন্যে কোন আন্দোলন করতে হয়নি। সেটা ছিল আল্লাহ্‌র দান—মানুষের জন্মগত অধিকার হিসেবে।

ধরুন, উত্তরাধিকারী আইন। এ আইনে যেখানে শুধু ছেলে সম্পত্তি পেত, সেখানে মা-বাবা, স্ত্রী-কন্যারও সম্পত্তিতে অধিকার সৃষ্টি হলো। অর্থাৎ সম্পত্তি কেন্দ্রীভূত না হয়ে ভাগ হওয়া শুরু হলো। একটা আজগুবি কথা ধরা যাক। যদি গোড়া থেকে রাশিয়াতে সবাই মুসলমান হয়ে যেত তা হলে লেনিনের সময় যেসব রাজ-রাজড়ার বিরুদ্ধে অভিযান সৃষ্টি হয়েছিল তাদের আগে থেকেই কোন অস্তিত্বই থাকতো না। অবশ্য অনেকে বলবেন, কেন, মুসলমানের মধ্যে যে রাজা-বাদশাহ, বড়লোক ছিল, তার কি? তার উত্তরে আমি অন্যত্র যা বলেছি, তাই বলবো। সেটা হলো, সে সব ইসলামের সত্যিকার চিন্তাধারার ব্যতিক্রম হিসেবে ঘটেছে। যার জন্যে আমরা সে ইতিহাসকে উজ্জ্বল বলি; গৌরবময় বলতে পারি না। হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম থেকে সব খুলাফায়ে রাশেদীনের জীবন দেখলে তাঁরা যে কত গরীবের মত জীবন-যাপন করতেন তা দেখা যায়। তাঁদের-কেই আমাদের আদর্শ করতে হবে। কারণ গরীবের মত না থাকলে তাঁদেরকে বোঝা যায় না।

এখন বাংলাদেশে আমরা এমন একটা পর্যায়ে এসেছি যে, আমাদের জমিজমা নেই; এবং ব্যক্তিগত পর্যায়েও শিল্প ইত্যাদি বেশী নেই; এমনকি সমাজতন্ত্র—যেটা আগ্রহের সঙ্গে বিচার না করে গ্রহণ করেছিলাম সেটাও আমাদের নিরাশ করেছে; আমাদের অনেকটা ত্রিশঙ্কুর অবস্থা। মধ্যখানে ঝুলে রয়েছি। এখন কি কর্তব্য?

এখন আমি মনে করি সরকার কর্তৃক সমাজতন্ত্রের প্রতি-ষ্ঠার উপর না নির্ভর করে কিংবা যতটুকু পারা যায় নির্ভর করে

আমরা ইসলামে প্রদত্ত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দ্বারা যতটা পারা যায়, দীন-দরিদ্রের কাজে আসার চেষ্টা করতে পারি। এ সূত্রে প্রথমে যাকাতের কথা উল্লেখ করতে হয়।

ইসলামে টাকা জমিয়ে বড় লোক হওয়া কঠিন ; যে জমায় তাকে হয় টাকা খাটাতে হবে যাতে করে অন্যে এর থেকে উপকার পায়। যেমন তাকে কোন শিল্প প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ; নইলে তাকে তার উপর প্রতি বছর যাকাত দিতে হবে। ধরুন, একটা লোকের এক লাখ টাকা ব্যাঙ্কে রয়েছে। তাকে তার জন্যে প্রতিবছর আড়াই হাজার টাকা দিতে হবে। অধিকন্তু সে যখন বড়লোক, তখন তার ঘরে হীরে-মুক্তো কিংবা অলংকার নিশ্চয়ই থাকবে। এবং সে সবের জন্যেও তাকে বর্তমান মূল্য ধরে পঞ্চাশ হাজার দাম হলে বারশো টাকা প্রতিবছর দিতে হবে। এর-উপরও গরীব-দুঃখী, ইয়াতীম ইত্যাদিকে সাহায্য করার কর্তব্য রয়েছে।

সব চাইতে বড় কথা, ইসলাম টাকা জমানোর প্রশ্রয় দেয় না ; এমনকি টাকা জমিয়ে যদি অন্য কোন মূল্যবান জিনিস করা হয়, যা সময়মত বিক্রী করতে পারে, তাহলে তারও যাকাত দিতে হয়। এমনকি যদি কাউকে টাকা ধার দেয়া হয় যেটা ফিরে পাওয়ার আশা রয়েছে, তা হলে তার উপরও শতকরা আড়াই টাকা হারে যাকাত দিতে হবে।

সুতরাং সরকারের যে তন্ত্রই থাকুক, ইসলামের ধর্মীয় সমাজ ব্যবস্থায় আমাদের দায়িত্ব এড়ানো কঠিন। আমরা এ বলেই ক্ষান্ত থাকতে পারি না যে, সরকার গরীবদের দুঃখ মোচন করবে আর আমরা নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক বলে জাহির করে সরকারের উপর সব ভার চাপিয়ে দিয়ে নিজে ৫৫৫ সিগারেট খাব আর কাগজে-কলমে ও মৌখিকভাবে গরীবের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলে, আমরা নিজেদেরকে খুব প্রোগ্রেসিভ ধরে বাহাদুরি করবো।

যে সমাজতন্ত্রের ইঙ্গিত চৌদ্দশো বছর আগে সার্থকভাবে অনুসৃত হয়েছিল সেটা ক্রমেই নিম্নমুখী হয়ে চলতে লাগলো ; আমাদের মধ্যে লেনিনের মত কেউ দুর্দান্তভাবে সেই তন্ত্রটাকে কাজে লাগিয়ে তাকে পূর্ণ জীবিত করতে পারলো না ; সেটাই আফসোস।

দৈনিক আজাদ

২৪-৯-৭২

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন দু'হাজার বছরের উপরের বৈদিক শ্রুতি ও 'স্মৃতির' আইনকে পরিবর্তিত করে যে আইন বর্তমানে ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়েছে তা হুবহু যে মুসলিম আইনের প্রতিচ্ছায়া সেটা ধরলে এই কথা বলা যায় যে, বড়াই করতে জানলে মুসলমান হিসেবেই সব চাইতে বেশী বড়াই করা যায়।

আজ সে বড়াইয়ের কায়দাটা সম্বন্ধে বলবে। বড়াই করার মত সামগ্রী কি রয়েছে সেটা অতি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণভাবে বড়াই করার মত উপলব্ধি করে যদি বড়াই করা যায়, তা' হলেই শুধু সেটা ঠিকসই হতে পারে। উদ্দীপনাপ্রসূত ভাবপ্রবণতার বড়াই নিজের কাছে যত জোরদার মনে হয় অপরের কাছে ততটা যে মনে হতে পারে না, শুধু তা নয়; সেটা বরং তার কাছে কৌতুককরও মনে হতে পারে এবং একজন মুসলমানের ধর্ম সম্বন্ধে উদ্দীপনাপ্রসূত কোন কিছুর বড়াই অন্য ধর্মাবলম্বীর তো দূরের কথা, একজন সত্যিকার নিষ্ঠ মুসলমানের নিকটও গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তার প্রধান কারণ হলো এই যে, ইসলামই এমন একটি ধর্ম যেটা অতি সাধারণভাবে, সাধারণ লোকে, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারে এবং এই ধর্মের প্রতিটি প্রক্রিয়া মানবের জন্যে যে কল্যাণকর, সেটা অনায়াসে বুঝতে পারে। এবং তা পারে বলেই ইসলামকে শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা হয়েছে। নইলে কোন ধর্মই ইসলামের কাছে ছোট নয়; কারণ ইসলাম বিশ্বাস করে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর আল্লাহ্‌র রাস্তায় মানুষকে পরিচালিত করার জন্যে এ ধরায় এসেছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকেই মুসলমানদের কাছে নমস্য।

এবং যেহেতু আমি মুসলমান হিসেবে আমাদের দৈনন্দিন ও আনুষ্ঠানিক কার্যকলাপে এবং চিন্তাধারায় ব্যতিক্রমধর্মী বৈজ্ঞানিক অনুশীলনের সূক্ষ্ম বিচার দ্বারাও যে প্রতিটি ব্যাপারে গৌরব বোধ করার

মত বস্তু পাই, সেই জন্যে আমি আমার নিজের চিন্তাধারায় যেভাবে ইসলামকে অনুভব করেছি সেভাবেই বলবো।

প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ঈদে-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে মিলাদ হচ্ছিল। বন্ধুবর ওসমান গনি ছিলেন প্রিন্সিপাল। মরহুম প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খান ছিলেন সভাপতি। তাঁর পার্শ্বে বসেছিলেন অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান। আর যেসব মনীষী সে মিলাদে উপস্থিত ছিলেন, ঠিক মনে আছে তার মধ্যে ছিলেন মরহুম মওলানা কবীরউদ্দীন এবং যতদূর মনে পড়ে ইঞ্জিনিয়ার মুফিত সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তার কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। এই জন্যে মনে করি যে, তিনি বর্তমানে তবলীগ আন্দোলনের একজন পুরোধা। আরো অনেক গণ্যমান্য মৌলানাও উপস্থিত ছিলেন, তাদের সবার নাম মনে নেই। যাদের নাম বললাম মনে রয়েছে; তা' রয়েছে দুটো কারণে। একটি হলো, এরা আমার ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এবং দ্বিতীয়টি এদের মতকে আমি প্রাধান্য দিয়ে এসেছি।

মিলাদ শুরু হয়, ঠিক তেমনি সময় আমি উপস্থিত হয়ে এক কোণে বসি, বিরাট তাঁবু, লোকে পরিপূর্ণ। তার মধ্যে আমার উপস্থিতিটা লক্ষ্য করার মত ছিল না। কিন্তু লক্ষিত হলো। অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান সাহেব সভাপতি প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খানের কানে কানে কি যেন বললেন এবং প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খান সমবেত লোকদেরকে জানালেন যে আমি সেই মিলাদে বক্তৃতা করবো। আমি তার আগে কোন মিলাদে বক্তৃতা দেই নি, এবং তারপরে একবার মাত্র দিয়েছি সেটাও শ্রদ্ধেয় ডাঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের অনুরোধে ওর প্রায় পনের বছর পরে।

আমি যে বক্তৃতাটা দিয়েছিলাম সেটা ব্যক্তি-নির্বিশেষে সবাই এতদূর পছন্দ করেছিলেন যে তাতে আমি অভিভূত হয়েই শুধু পড়িনি; তাদের সেটা সমর্থনে আমার মনের জোর সেদিন যে বেড়েছিল সেটা আর এ পর্যন্ত হ্রাসপ্রাপ্ত হয়নি। সেদিন আমি যে কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, সেই কথার প্রেক্ষিতেই সম্পূর্ণ বক্তৃতাটা দিয়েছিলাম এবং সেটা অত গ্রহণযোগ্য হয়েছিল বলে ইসলাম সম্বন্ধে আমার উপলব্ধির সত্যতা নিরূপণের অবকাশ পেয়েছিলাম।

আমি এই কথা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করি: সমবেত বুযর্গ ব্যক্তিগণ! আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করছেন, আমি উপস্থিত হওয়া-

মাত্র অধ্যাপক আলী আহসান সাহেব প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খান সাহেবের কানে কিছু বললেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে বক্তৃতা দেয়ার কথা ঘোষণা করলেন। সুতরাং বুঝতে পারছেন আমাকে আগে থেকে বক্তৃতা দেয়ার জন্যে তালিকাভুক্ত করা হয় নাই। এবং সেটা এক রকম ঠিকই। কারণ আমি কোন মৌলানা-মৌলভী নই; এবং মিলাদে আমাকে বক্তৃতা দেয়ার কথা কারও মনে হওয়ার কথাও নয়। কিন্তু এখন যখন আমার বক্তৃতা দেয়ার কথা উঠলো, তখন তার প্রেক্ষিতে আমার কি বলার রয়েছে সেই কথা বলেই আমার বক্তৃতা দেব। এটা আল্লাহ্‌রই মেহেরবানী যে, তাঁরা আমাকে বলতে বলেছেন। কারণ ইসলাম আমি মনে করি শ্রেষ্ঠ ধর্ম এই জন্যে, যে এটা জনসাধারণের নিত্যনৈমিত্তিক জীবন যাপনের জন্যে এবং তাদের সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝার জন্যে সর্বোৎকৃষ্ট। এবং যেহেতু আমি তেমনি একটি সাধারণ ব্যক্তি, যে ইসলামকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক আনন্দ পেয়েছে। সেহেতু আমারও অন্যের সঙ্গে বলার সমান অধিকার রয়েছে। কারণ ইসলাম সংকীর্ণ কিংবা গণ্ডীভূত নয়, ব্যাপ্ত এবং সার্বজনীন। সুতরাং মৌলানা কবীরউদ্দীন সাহেবেরও যেমন ইসলাম সম্বন্ধে অনুভূত সত্য ব্যক্ত করার অধিকার রয়েছে, নূরুল মোমেনেরও যে তেমন রয়েছে; আজকে সেই স্বীকৃতির বলে বলীয়ান হয়ে আমার কথা বলবো।

এবং সেদিন মন খুলে বলেছিলামও। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের মহাপ্রয়াণের মাত্র চল্লিশ বছর পরে কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে এবং তা সত্ত্বেও ইয়াজীদের খিলাফত টিকে থাকে সুতরাং তা থেকে তাদেরকে বুঝতে বলেছিলাম মুসলমান মানুষ হিসাবে কতদূর অধঃপতিত হয়েছিল। মিসর, মরক্কো ও স্পেন বিজয়ের গৌরবও সত্যিকার গৌরবের পথে আসেনি। কারণ যারা সে গৌরব এনেছিলেন তারা খলীফার নির্দেশ এড়িয়ে তা করেছিলেন। এবং যেসব উদাহরণ দিয়ে দিয়ে আমি বলেছিলাম আজ তা' মনে নেই, তবে মুসলিম কর্তৃক লিখিত ইতিহাস তখনকার দিনে আমার যা ঘাটা ছিল তার ভিত্তিতেই তা বলেছিলাম। ইসলামের ঐ গৌরবময় দিনে বেশীর ভাগই তথাকথিত গৌরবান্বিত ব্যক্তিগণের চরিত্রের যে দৈন্য তখন দেখা দিয়েছিল তা বিস্তারিত উল্লেখ করে এইটুকু বলে-

ছিলাম, খালিদ প্রমুখদের মত যদি কতিপয় শ্রেষ্ঠ মানব তখন মুসলমান হিসেবে না পেতাম তা হলে তা মর্মাহত হওয়ার মত হতো। এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে যে স্রোতে চিন্তাবিদগণ ব্যতীত রাজনীতিক ও, সাধারণ ব্যক্তিগণ গা ভাসিয়ে দিয়ে এসেছিলেন, তারই ফল আজকের মুসলিম জগতের অধঃপতিত জীবন। সুতরাং মুসলমান হিসেবে, আমাদের গৌরব বোধ করার কোন কারণ আজ নেই। তাহলে আমরা বেঁচে রয়েছি কেমন করে?

আমরা বেঁচে রয়েছি—তার কারণ ইসলাম এমন একটি শক্তিশালী জীবনপ্রসূ চিরন্তন ধর্ম, যার কোন প্রকার আশ্রয় নিলেই সেটা মানুষকে সজীব করে তোলে। এই বলে ইসলামের সকল দিক আমি যেমন করে অনুভব করেছি তেমন করে বলেছিলাম এবং বলেছিলাম, যে-ক্ষেত্রে ইসলাম মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত বলেছে, সে ক্ষেত্রে মুসলমান যে কতদূর পিছিয়ে রয়েছে তা বর্তমান বিশ্বকে দেখলেই বোঝা যায়। যে ক্ষেত্রে জীবনের প্রত্যেকটি কার্য ইবাদত, সে ক্ষেত্রে মুসলমান হিসেবে নিজেদের যে প্রতিষ্ঠিত করার প্রত্যেকটি কাজও ইবাদত এটা আমরা আজ বুঝতে পারি না বলে আমাদের এই অধঃপতনের কারণ।

আমার এই ধরনের লেখা যারা নিয়মিত পড়েছেন তারা আমি যা মোটামুটি ইসলাম সম্বন্ধে অনুভব করি তা উপলব্ধি করেছেন, এমনকি মুসলমানদের মধ্যে যারা ধর্মের পথে ঘেষেন না, তারাও তা পছন্দ করেছেন।

আমি পঁচিশ বছর আগের কথাটা এই জন্যে উল্লেখ করলাম যে, আমার দৃষ্টিভঙ্গীতে আমি ইসলামকে যে রকম দেখি, তা তাঁরা তখন শুধু পছন্দ করেন নি, প্রশংসিতভাবে মঞ্জুরও করেছিলেন।

ঐ ঘটনার পনের বছর পরে আমি যে-মিলাদে বক্তৃতা দিই। সেটা হলো ঈদে-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ফজলুল হক হলে, শ্রদ্ধেয় ডাঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেবের অনুরোধে। আমি তাঁকে বক্তৃতা দেয়ার প্রাক্কালে জিজ্ঞাসা করি "স্যার, ঈদে-মিলাদুন্নবী যখন, তখন এটা খুশীর ব্যাপার। সুতরাং এ বক্তৃতা গুরুগম্ভীর না হয়ে হাসি-খুশীর কথা বলা যাবে কি—না?" তিনি বললেন ঃ "নিশ্চয়ই, হযরত তো নিরস লোক ছিলেন না।" আমি এ কথাটা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম শুধু এই জন্যে যে, বহু

ছাত্রকে দেখতাম তারা কর্মকর্তা হিসেবে মিলাদের সব দায়িত্ব খুশী মনে গ্রহণ করলেও ইসলাম নিয়ে গর্ব করার মত কিছু পেত না।

সেখানে আমি যে কোন আধুনিক মতবাদের প্রেক্ষিতে ইসলামের প্রযুক্তিসমূহ যে অধিকতর প্রযোজ্য সে কথা বলে বলেছিলাম যে আমাদের চিন্তা করতে হবে কি করে অন্যের উপর চিন্তার আধিপত্য বিস্তার করা যায়।

এবং সেই সূত্রে একটি গল্প বলেছিলাম যেটা সত্যিকারভাবে হাস্যকর মনে হলেও তার প্রতিক্রিয়া গভীর হয়েছিল লক্ষ্য করেছি।

রঞ্জিত ছিল আমার আইন ক্লাসের নিকটতম বন্ধু, ডাঃ সুধীশ রায়ের সৌজন্যে মুসলিম আইন যখন সকল হিন্দু ছেলেদের কাছে অপ্রত্যাশিতভাবে আদৃত হয়েছিল, তখনকার দিনে রঞ্জিত আমাকে বললো ঃ "অবশ্য সকল ধর্মের গোড়ায় গেলে দেখা যায় যে, সব ধর্মই মূলত এক। যেমন ধর ভগবান সম্বন্ধে আমরাও বলি 'একমেবাদ্বিতীয়ম' কিন্তু একটা ধারণা সম্বন্ধে তোদের সঙ্গে আমাদের কোনক্রমেই সমন্বয় হতে পারে না। সেটা হলো আমাদের পুণর্জন্ম। সেটাকে তুই কি করে তোদের সঙ্গে সমন্বয় করবি ?"

আমি বললাম ঃ "সেটার সমন্বয়ের ধারণাটা তো সব চাইতে সোজা। শেষ জন্মটায় তুই যদি মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করিস তা হলে তো তোর পুণর্জন্ম হবে না।"

আমি এই গল্পটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ শহীদুল্লাহ সাহেব সহ সকলেই হাসলেন যেমন রঞ্জিত ও আমি হেসেছিলাম। কারণ কথাটা হাস্যকর। কিন্তু গল্পটা বলার উদ্দেশ্য হলো, হীনমন্যতায় না ভুগে আমাদের মনকে সজাগ রাখার জন্যে আমাদের চিন্তাধারাকে সব কিছুর উত্তর দেয়ার জন্যে তৈরী রাখা এবং এই পন্থা ধারা অনুসরণ করে আমার নিজ মতানুসারে ইসলামিক সোশ্যালিজমের কথা বলবো যার জন্যে আমি মনে করি কার্লমার্কস ও লেনিন তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও মিঃ হার্ট হযরত (সাঃ)-কে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলে ধরেছেন।

দৈনিক আজাদ
১৭. ৯. ৭৮

ধরুন অনেক দিন আগের এক আজগুবি কাহিনী : পুরাতন পন্থী এক ধনি ব্যক্তি তার একটি বুদ্ধিদীপ্ত ও তীক্ষ্ণ মেধার ছেলের জন্যে এমন একজন অধ্যাপকের খোঁজ করছিলেন যিনি ঐ ছেলেটির চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করে তার বিচারকরণ পদ্ধতিকে এমন সাবলীলভাবে কার্যকরী করতে সক্ষম হন, যাতে করে ঐ ছেলেটির মধ্যকার চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের কাজে আসতে পারে।

অনেক অধ্যাপক এলেন, গেলেন কিন্তু ছেলেটির বুদ্ধিদীপ্ত মনকে কার্যকরী পথে পরিচালিত করার কোন হদিস পলেন না। অবশেষে ঐ ধনী ব্যক্তি স্থানীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষাসম্পন্ন অধ্যাপক খিজির খানের শরণাপন্ন হলেন। তাঁর মত বিচক্ষণ ব্যক্তি ঐদিনে পাওয়া দুষ্কর ছিল। খিজির খান বললেন, আমি প্রাথমিক পর্যায়ে তার খুশির পরীক্ষা করে দেখবো। সে যদি তাতে উত্তীর্ণ হয় তবেই তার শিক্ষকতা গ্রহণ করবো, নইলে নয়। ধনী ব্যক্তি তাতে রাজী হলেন। তবে তিনি বললেন, আপনি যখন তার বুদ্ধির বিচার করবেন তখন আমি উপস্থিত থাকবো। অধ্যাপক খিজির খান রাজী হলেন। তবে মহামতি খোয়াজ খিজিরের মত বললেন, আমার প্রশ্ন কিংবা আপনার ছেলের উত্তর, এর কোনটা আপনার কাছে বেখাপ্পা মনে হলেও আপনি সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না। পরে সব জানবেন। ধনী ব্যক্তি রাজী হলেন।

পরীক্ষা আরম্ভ হলো। অধ্যাপক খিজির খান ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এমন একটি সংখ্যা লিখ, যেটা সোজা করে দেখো, উল্টো করে দেখো, একই থাকবে।" ছেলেটি অবলীলাক্রমে লিখলো '8'। অধ্যাপক ঘুরিয়ে বাবাকে দেখালেন, উল্টোসিধে একই। বাবা খুব খুশী হলেন। এবার অধ্যাপক ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন। এ ধরনের কতগুলো সংখ্যা রয়েছে বলো। ছেলেটি বললো, "এ ধরনের অসংখ্য সংখ্যা

রয়েছে। ধনী পিতা আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন, "তা কি করে হয়, ৪-ইতো একমাত্র সংখ্যা।" অধ্যাপক খিজির খান বললেন "ও ঠিকই বলেছে। আপনি প্রশ্ন করে আপনার কথার খেলাপ করেছেন সুতরাং আপনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করুন।" পিতা তখন ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আমি আর প্রশ্ন করবো না। আপনি আপনার কাজ করে যান।" অধ্যাপক তখন ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, "একটি খুব ছোট টেবিলে সাতটি মাছি বসে রয়েছে, তুমি হাতের থাপ্পড় মেরে তার একটিকে মারলে। ক'টি রইলো?" পিতা বোধ হয় মনে করলেন প্রশ্নটা সোজা হয়ে গেল, তাই তিনি সাথে সাথে প্রশ্ন করলেন, "আর এক থাপ্পড়ে দুটো মারলে আর ক'টা রইলো?" ছেলেটি অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলো, "স্যার আপনাদের দু'জনকে সঠিক দুটো উত্তর দেব, না কি সঠিক একটি উত্তর দু'জনকে দেব?" অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'জনের জন্যে কি সঠিক একটি উত্তর হতে পারে?" ছেলেটি বললো, "জি হাঁ।" "তা হলে উত্তর আমি পেয়ে গেছি।" অধ্যাপক বললেন।

পিতা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "দু'জনের জন্যে সঠিক এক উত্তর কি করে হতে পারে?"

অধ্যাপক বললেন, "আপনি আবার প্রশ্ন করেছেন, সুতরাং আপনি আমার সঙ্গ ত্যাগ করুন। আমি তো বলেছি আপনি পরে সব কিছু জানতে পারবেন, তবে এত অধীর হচ্ছেন কেন?" পিতা এবারও ক্ষমা চেয়ে থেকে গেলেন।

এরপর অধ্যাপক ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, "দু'টি লোক তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে ঢুকতে গেল। একজনের কপালে তার অজান্তে রান্না ঘরের একটু ঝুল ভরে গেল। এখন ঐ লোক দু'টির কে কি করবে?" ছেলেটি বললো, "যার কপালে ঝুল ভরে নাই, সে তার কপালটা রুমাল দিয়ে মুছে ফেলবে।"

পট করে পিতা প্রশ্ন করে বসলেন, "সে মুছবে কেন? যার কপালে ঝুল ভরেছে, সেই তো মুছবে?"

অধ্যাপক খিজির খান পিতাকে সঙ্গ পরিত্যাগ করার জন্যে আবার শাসালেন। পিতা এবারও ক্ষমা প্রার্থনা করে টিকে গেলেন।

এরপর অধ্যাপক ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, "সম্রাট বাবর ও আওরঙ্গ-জেব দাক্ষিণাত্য অভিযানকালে এক সঙ্গে সাড়ে চার ফুট চওড়া একটা খাটে একরাত শয়ন করেন, বিশ্বাস হয়?"

ছেলেটি অম্লান বদনে বললো "কেন হবে না, স্যার! সাড়ে চার ফুট প্রশস্ত খাটে দু'জন খুবই শুতে পারে।" পিতা চট করে প্রশ্ন করলেন, "এটা কি করে বলছো তুমি?"

অধ্যাপক বললেন, "আপনি আবার প্রশ্ন করেছেন?" পিতা বললেন, "ভুল হয়েছে আর করবো না।"

অধ্যাপক এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "রবীন্দ্রনাথের সব চেয়ে বড় কবিতা কোনটি?" ছেলেটি বললো, "শেষের কবিতা।" পিতা নিজেকে আর রাখতে পারলেন না, অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটা কি বলছো?"

অধ্যাপক বললেন "বাস, আর দরকার নেই। আপনি নিজেকে যখন সামলাতে পারছেন না; তখন এখানেই পরীক্ষা শেষ হলো।"

এই বলে হযরত খোয়াজ খিজির যেমন এক-এক করে প্রতিটি কার্যকারণকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন, তেমনি করে তিনিও করলেন।

তিনি ছেলেটিকে বললেন, "এবার তোমার বাবাকে বলো শুধু ৪ নয়, উল্টো-সিধে যেমন করেই দেখো ৪-এর মত একই রকম দেখা যাবে এমন সংখ্যা অসংখ্য রয়েছে, তা কি করে হয় লিখে দেখিয়ে দাও।" তখন ছেলেটি লিখলো: ৪, ৪৪, ৪৪৪, ৪৪৪৪— সঙ্গে সঙ্গে তার পিতা বললেন, "বুঝেছি আর দরকার নেই।" অধ্যাপক এবার জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার থাপ্পড় দিকে টেবিলের উপর মাছি মারার কথাটা ধরা যাক, আমার প্রশ্নের উত্তরে ছ'টি মাছি থাকে তোমার বাবার প্রশ্নের উত্তরে পাঁচটি মাছি থাকে। কিন্তু তুমি যে বললে একই উত্তর দু'জনের জন্যে সঠিক হবে। সেটা কিভাবে হবে?" ছেলেটি বললো, "কারণ খুব ছোট্ট টেবিলের উপর থাপ্পড় দিয়ে যে কটা মাছি মারি না কেন, একটাও থাকবে না। সুতরাং উত্তর উভয় ক্ষেত্রেই একই হবে।" পিতা উত্তর শুনে গর্বে স্ফীত হয়ে বললেন, "সাবাস।"

"এবার বলতো রান্না ঘরে ঢোকার সময় যার কপালে ঝুল লাগলো না সে কপাল মুছলো, অথচ যার কপালে ঝুল লেগেছিল সে মুছলো না, তা কেন?" বাবা তা জিজ্ঞাসা করে বসলেন।

উত্তরে ছেলে বললো, "যার ঝুল লেগেছিল সে তো বুঝতেই পারেনি তাই তা মুছেনি। অন্যে তাকে দেখে যেমন হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবেই কপালটা মুছে নিল। অপ্রস্তুত হতে পারে বলে অন্যকে বললো না।"

অধ্যাপক খিজির খান এবার ছেলেটাকে বললেন, "সাড়ে চার ফুট চওড়া একটা খাটে দু'জন শুতে পারে বলে তোমার মত একজন বুদ্ধিমান ছেলে, একশো বছরের তফাত যাদের মধ্যে সে রকম দুজন সম্রাট একখাটে শুয়ে রাত কাটিয়েছিলেন, তা' কি করে বিশ্বাস করলে?"

মুখে হঠাৎ একটা চড় খেলে যেমন হয়, তেমনি লাল হয়ে ছেলেটি বললো, "তোবা, তোবা, আমি অতোটা তো খেয়াল করিনি, ছি, ছি, এ হতেই পারে না।" বাবা ও অধ্যাপক হেসে উঠলেন। এরপর অধ্যাপক জিজ্ঞাসা করলেন, "শেষের কবিতা বইখানা শুধু দেখেছ পড়নি। তাই না?"

"জি হাঁ।" উত্তর দিলো ছেলেটি। "সুনাম দেখে এবং মোটা বলে, এ রকম একটা ধারণা করেছিলে। এটা একখানা উপন্যাস?" এ কথা শুনে ছেলেটা আগের মতই লজ্জা পেল।

তখন অধ্যাপক খিজির খান পিতাকে বললেন, "আশা করি আপনিও আপনার ছেলের চিন্তাধারার পার্থক্য অনুভব করতে পেরেছেন। অতীতের সঙ্গে আপনার সংযোগ থাকায় তার চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক জ্ঞানের অপ্রাচুর্য যেমন সহজে ধরতে পেরেছেন, তেমনি আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে আপনার পরিচয় না থাকায় তার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাপ্রসূত উত্তরগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে বুঝতে সক্ষম হন নি।

এটা আপনার পক্ষে যেমন ঘাটতি দেখা যায়, তেমনি ঘাটতি দেখা যায় আপনার ছেলের পক্ষে; ঐতিহাসিক জ্ঞান ও ঐতিহ্যকে নিজের মধ্যে স্থিত না করার।" এই বলে অধ্যাপক খিজির খান ছেলেটিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এই দুটো সামান্য প্রশ্নের সমাধান যে দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখেছিলে তার ভুল বুঝতে পেরেছো?" ছেলেটি অকপটে তা' স্বীকার করলো। তখন অধ্যাপক বললেন, "তা' হলে কি তুমি অতীতের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করে তোমার বর্তমানের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে চিন্তাধারাকে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে রাজি আছ?" ছেলেটি সাগ্রহে স্বীকার করলো! তখন অধ্যাপক তার পিতাকে বললেন, "আমি আপনার সন্তানের শিক্ষকতা গ্রহণে রাজি রয়েছি। এ ছেলেটি বর্তমান চিন্তাধারায় নিঃসন্দেহে অগ্রণী হবে। যদি সে অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত না হয়। আপনারও আধুনিক চিন্তাধারার কিছু শিক্ষা-লাভ করা উচিত ছিল; কারণ আপনি চট করে এর উত্তরগুলো বুঝতে

সক্ষম হননি। কিন্তু তা' আবার নতুন করে আরম্ভ করতে হবে, এবং তা' না হবে আধুনিক, না হবে ঐতিহ্যবাহী পুরাতন জিনিস।" এই বলে তিনি হেসে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে পিতা-পুত্রও।

অতঃপর তিনি বললেন, "এইভাবেই 'জেনারেশন গ্যাপ' বা যুগ-পার্থক্য সৃষ্টি হচ্ছে। আপনাদের ঝোঁক সম্পূর্ণ পুরাতন ঐতিহ্যের দিকে যদি থাকে, তবে নতুনদের ঝোঁক হয় সম্পূর্ণ আধুনিকতার দিকে। এই ঝোঁক কিন্তু ইসলাম পছন্দ করে না। ইসলামের পন্থা হলো মধ্যবর্তী পন্থা। সেই জন্যেই ইসলাম হলো শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এর বাইরে মানুষের উন্নতির জন্যে করণীয় কিছুই নেই। সব আইট-ইজমই ইসলামের মধ্যে স্থিত রয়েছে, শুধু বুদ্ধি দিয়ে উদ্ধার করার প্রশ্ন। সুতরাং ইসলাম সত্যিকারভাবে অনুসরণ করলে সবাই পুরাতন ঐতিহ্যের প্রেক্ষিতে নতুনকে যেমন অকাতরে গ্রহণ করতে পারবে, তেমনি নতুনও পুরাতন ঐতিহ্যকে মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে বাধাপ্রাপ্ত হবে না। আমি এই মধ্যপন্থী, সুতরাং উভয় যুগ-আক্রান্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার মানসিক কোন অমিল থাকলেও তা আমি সহজে মিটিয়ে ফেলি। এবং তার ফলে উভয় যুগের লোকেরা আমার পথে অনেকটা এগিয়ে আসে। আমার লেখা যে উভয় দলের লোকেরাই পছন্দ করে; এর মধ্যেই তার অনেকটা প্রমাণ মেলে।"

দৈনিক আজাদ
৫. ১১. ৭৮

জীবনের পরিপূর্ণতা

প্রত্যেক একুশে ফেব্রুয়ারীতে আমি কিছু না কিছু সৃষ্টিধর্মী লেখা লিখি। এবং তা' লিখি আমাদের ভাষার জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর জন্যে। এ বছর একুশেতেও আমি এমনি একটি লেখা শুরু করেছি। এবারকারটা হলো একখানি উপন্যাস। এই উপন্যাস লেখার প্রেরণাই বলুন কিংবা দর্শনই বলুন আমি পেয়েছি আমার ছোটবেলার একটি স্বপ্ন থেকে। স্বপ্নটা যখন দেখি তখন আমার বয়স ছিল বড়জোর পাঁচ বছর। ধরতে গেলে আমার ছোটবেলার কোন ঘটনার, স্বপ্ন হলেও, সেই প্রথম স্মৃতি।

এবং ঐ স্বপ্নটা মনে রাখার প্রধান কারণই হচ্ছে এই যে, স্বপ্নটি ছোটবেলায় যখনই আমার মনে ভেসে উঠতো তখনই আমাকে খুবই বিষাদগ্রস্ত করতো। এবং পরে যখন আমি যুবক অবস্থায় কোন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতাম, তখনও এই স্বপ্নটা মনে পড়লে আমার মন ভারী ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়তো।

এমন কি গত দশ-বার বছর ধরে স্বপ্নটার কথা যখনই মনে পড়েছে তখনই, আমার মনটা খারাপ হয়ে গেছে ; কারণ মনে করেছি এখনতো জীবনে একরকম ধরতে গেলে প্রতিষ্ঠিত, তবে স্বপ্নটা দেখলাম কেন ?

কিন্তু বছর খানেক আগে হবে, এই স্বপ্নের অর্থ এত পরিষ্কারভাবে আমার কাছে প্রতিভাত হয় যে, ঐ স্বপ্নের ওপর মানুষের জীবনভিত্তিক একখানি উপন্যাস লেখার প্রেরণা ও আগ্রহ আমার মধ্যে গভীরভাবে সৃষ্টি হয়। এবং এবারকার একুশেতে সেই উপন্যাসখানা লেখা শুরু করি। আমার বারবার শুধু এই মনে হচ্ছে, যদি এই স্বপ্নের অর্থ আমি আমার যৌবনে উদ্ধার করতে পারতাম, তাহলে আমারই শুধু নয়, তার প্রকাশ যে কোন মানুষের পক্ষেই নিঃসন্দেহভাবে অধিকতর কল্যাণ-কর জীবন-যাপনে সাহায্য করতে পারতো।

আমি আন্দাজ করেছি যে, যখন আমি স্বপ্নটা দেখি তখন আমার বয়স বছর পাঁচেক হবে তা' শুধু এই জন্যে যে, আমি ঘুমের ঘোরে বিছানায় প্রস্রাব করি এবং ভিজা জায়গা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্যে ঘুমের ঘোরে এমনভাবে সরে যেতে থাকি যে, শেষ পর্যন্ত আমি খাট থেকে নীচে পড়ে যাই এবং সেটাকেই স্বপ্নে আসমান থেকে নীচে ফেলে দেয়া হিসেবে দেখি।

আমি সেই স্বপ্নে দেখি বিকেল হয়েছে। আমি আমাদের গ্রামে বেড়াতে বেরিয়েছি। হঠাৎ দৃষ্টি পড়লো একটি বড়ো মাঠের এক-প্রান্ত থেকে একটা সিঁড়ি আসমানে উঠে বহু উর্ধ্বে চলে গিয়েছে। আমি ছুটে সিঁড়িটার গোড়ায় যাই এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে থাকি। উঠতে উঠতে বহু ফেরেশতা দেখি এবং তাদের মধ্য দিয়ে আরও উপরে চলে যাই। শেষে দেখি অদ্ভুত ও অপূর্ব আলোর মত কিছু। আমি দেখেই অনুভব করলাম হয়তবা ইনিই আল্লাহ্। কারণ, মা বলতেন আল্লাহ্ হলেন নূর বা জ্যোতির মত। আল্লাহ্‌কে অনুভব করতে পেরে আমি খুব খুশী হলাম। কিন্তু যখন শুনলাম সেই নূর থেকে আওয়াজ এলো "এ শিশুটি কে?" তখন একটু ভীত হয়ে পড়লাম। কারণ মনে হলো আমার যাওয়াটা আল্লাহ্‌র পছন্দ হয়নি। ফেরেশতা-গণ সমস্বরে উত্তর দিলেন। "হে আল্লাহ্! এ পৃথিবী থেকে আসা ছোট একটি ছেলে।" আল্লাহ্ বললেন, "ওকে আবার নীচে ফেলে দাও।" অমনি সবাই ধরে আমাকে নীচে ফেলে দিলেন। আমি খাট থেকে নীচে পড়ে গেলাম।

মা আমাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "তুই কি করে এত বড় কোল বালিশটা টপকে পড়ে গেলি? ইয়া আল্লাহ্, বিছানায় প্রস্রাব করেছিস তাই বল?" আমার কান্না দেখে বললেন, "তা এত কাঁদছিস কেন? খুব ব্যথা পেয়েছিস না কি?" আমি বললাম্ "না।" তিনি বললেন, "তা হলে অত ফুঁপিয়ে কাঁদছিস কেন?" আমি মার কাছে স্বপ্নটি কাঁদতে কাঁদতে বলে জিজ্ঞাসা করলাম, "মা, আপনি না বলেন, আল্লাহ্ ছোট ছেলেদের ভালবাসেন? তা' হলে আল্লাহ্ অমনি করে আমাকে ফেলে দিলেন কেন?"

আমি হু-হু করে কাঁদতে থাকলাম। ভয় পাওয়া একটা ছোট বাচ্চাকে যেভাবে মায়ে বোঝান তেমনিভাবে একটু হেসে মা আমাকে

বোঝাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু আমার মনে এতদূর কষ্ট লাগছিল যে, মার চেষ্টা সত্ত্বেও শান্ত হতে পারছিলাম না। অবশ্য ঘন্টা খানেকের মধ্যে গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়লাম এবং স্বপ্নের কথা ভুলে গেলাম।

আমার ছোটবেলায় আমি কখনো ঐ স্বপ্নটা একেবারে বিস্মৃত হতে পারিনি। কারণ যখনই কোন অপরাধ করতাম এবং তার জন্যে গালাগাল কিংবা মার খেতাম তখনই আমার মনে হতো, আল্লাহ্ আমাকে পছন্দ করেন না বলেই আমাকে কেউ দেখতে পারে না।

অবশ্য আর একটু বড় হলে বুঝতে পারলাম যে, স্বপ্নতো স্বপ্নই। সুতরাং তা' নিয়ে আর ততটা মাথা ঘামাতাম না। তবু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটা প্রায়ই আমার মনে প্রশ্নের আকারে আসতো, স্বপ্নটা দেখলামই বা কেন?

পরে যখন ফ্রয়েডের স্বপ্ন বৃত্তান্তের সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় ঘটল, তখন অবশ্য নানা মতে এটাকে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করতাম। কারণ এই সময়ে জীবনে কোন কোন চ্যুতি-বিচ্যুতি ঘটলে ঐ স্বপ্নের প্রেক্ষিতে তা যাঁচাই করার চেষ্টা করতাম।

কিন্তু মাত্র দু'বছর আগে হঠাৎ যখন স্থির করলাম একখানা উপন্যাস লিখবো, এবং মনে করলাম সে উপন্যাসের ভিত্তিতে এমন একটি দর্শন থাকা প্রয়োজন যেটা প্রবর্তন-স্বরূপ উপন্যাসটিকে একটি কল্যাণকর উদ্দেশ্য লক্ষ্য করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তখন হঠাৎ এই স্বপ্নটির এমন একটি অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যা আমার মনে এলো যে, আমি খুশী হয়ে এবার ঐ স্বপ্ন দিয়েই আমার উপন্যাস আরম্ভ করে দিলাম।

আমার মনে স্বপ্নটির পক্ষে 'ক' এবং বিপক্ষে 'খ' যে যুক্তিতর্ক শুরু হলো তা' অনেকটা এই রকম :

ক : "আমরা মুসলমান, আমাদের তো খৃস্টানদের মতো আদিম পাপ বলে কিছু নেই, সুতরাং আমাদের প্রতিটি শিশু নিষ্পাপ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তা'হলে আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য লাভ করতে একটি বাচ্চার অসুবিধে কি ছিল? তিনি আমাকে ফেলে দিলেন কেন?"

খ : "আল্লাহ্ বাবা আদম মা হাওয়াকে পৃথিবীতে ফেলে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র অপার করুণা। তাদের ঐ সামান্য অপরাধটুকু কি তিনি ক্ষমা করতে পারতেন না? তিনি তাদেরকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ

জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছিলেন ; তা'হলে তাদেরকে ফেলে দিয়েছিলেন কেন ?"

ক ঃ "কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে জীবনযুদ্ধের সম্মুখীন করতে চেয়েছিলেন। তারা জীবনের দুঃখ কষ্ট বুঝবেন। যে কোন পরিপন্থী পরিস্থিতির সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবেন। তাদের বুদ্ধি দিয়ে, শক্তি দিয়ে সব বাধা-বিঘ্ন কাটিয়ে আল্লাহ্র রাস্তায় অগ্রসর হবেন। এবং পৃথিবীকে তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্যে একটি সুখময় স্থান তৈরী করবেন।"

খ ঃ "ঠিকই। আল্লাহ্কে সেবার মাধ্যমে ইবাদত করার উদ্দেশ্যও হলো তাই। চেষ্টা করে বাঁচার মত বাঁচতে হবে। যে কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, কোন রকম হতোদ্যম না হয়ে সব বাধা-বিঘ্ন জয় করতে হবে। শ্রেষ্ঠ জীব যে, তার কাছে সব বাধা-বিঘ্ন তুচ্ছ, সুতরাং সে পৃথিবীকে শান্তির রাজ্য সৃষ্টি করতে পারবেই।"

ক ঃ "সবই মানলাম। কিন্তু তা'হলেও একটা বাচ্চাকে, অমনিভাবে ফেলে দেওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ?"

খ ঃ "প্রতিটি মায়ের সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন তাকেও আল্লাহ্ ঐ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হিসেবেই সৃষ্টি করেন। এবং যে কোন পরি-স্থিতিতে তার বুদ্ধি শুদ্ধি যাই থাকুক, সেই বুদ্ধি দিয়েই সে যুদ্ধ করে জীবনকে সার্থক করতে পারে। কঠিনভাবে খাটলে, সর্বশক্তি প্রয়োগ করলে এবং আল্লাহ্র রাস্তায় অবিচলভাবে চললে একদিন না একদিন সে তার জীবনকে সার্থক করতে পারবেই। সে তার নিজের স্বার্থের খাতিরেই চলবে কিন্তু সৎপথে থাকায় তা' অন্যেরও উপকার করবে। এখন কেউ যদি তার এই কর্তব্যসমূহকে এড়াতে চায়, তাহলে তাকে কি বলা যাবে ?"

ক ঃ "তাকে এসকেপিস্ট বা একজন পলায়নপর মনোবৃত্তির লোক বলা যেতে পারে।"

খ ঃ "শুধু তাই নয়, তাকে একজন আল্লাহ্র আইন অমান্যকারী বলেও ধরা যেতে পারে। আমরা সকলেই আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছি এবং তাঁর নিকটে ফিরে যাব। কিন্তু পৃথিবীর জীবনটা ঠিকমত যাপন করে যেতে হবে, এটাই আমাদের কর্তব্য। যে চায় না সে ঐ এসকেপিস্ট বা আইন লঙ্ঘনকারী। তুমি কি তাদেরই একজন হতে চেয়েছিলে ?"

ক ঃ "না, না। কখনই না!"

খ ঃ "সেই জন্যেই আল্লাহ্ তোমাকে থাকতে দেন নি। তিনি তোমাকে যথেষ্ঠ বুদ্ধি, সহানুভূতি ও সামর্থ্য দিয়ে সৃষ্টি করে চেয়েছিলেন তুমি তোমার জীবনের আবর্তনকে সাধ্যমত সার্থকভাবে তোমার নিজের ও অন্যের কল্যাণ প্রয়োগ করে তার কাছে ফিরে যাবে। সেখানে তুমি কর্তব্য কাজ করার আগে ফিরে গিয়েছিলে বলেই আল্লাহ্ তোমাকে আবার ফেলে দিয়েছিলেন।"

স্বপ্নটির এই অর্থ উদ্ধার হওয়ার সংগে সংগে মনে পড়লো মেটারলিঙ্কের একটি লেখার কথা; যেখানে তিনি বলেছেন, 'শিশুরা জন্মগ্রহণ করার জন্যে বেহেশ্তে অপেক্ষা করছে।' এখন আমার মনে হয়, প্রত্যেক শিশু মায়ের গর্ভের মাধ্যমে পৃথিবীতে পতিত হয় একজন আদম হয়ে, তার জীবন-যুদ্ধে নতুন করে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে, এবং একজন হাওয়া হয় সেই আদমের সঙ্গ দেয়ার জন্যে, যাতে করে তারা হাতে-হাত জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করে পৃথিবীতে শান্তি ও সুখ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

বহু দেরীতে আমার সেই স্বপ্নের অর্থ উপলব্ধি হলো। আমি যে জীবনটাকে সেই স্বপ্নের প্রেক্ষিতে কত কম সার্থক করতে পেরেছি, তা' উপলব্ধি করে অভিভূত হয়ে গেছি। এর দ্বারা এ বোঝায় না যে, আমার জীবনে এ তক যা লাভ করেছি তার পিছনে সাধনা নেই কিংবা তা খুবই নগণ্য। এর দ্বারা শুধু এটুকু বলতে চাইছি যে, সবটাই নিজের লাভের জন্যে করা হয়েছে, সকলের সঙ্গে লাভবান হওয়ার মত কিছু করা হয় নি। এবং যে সময়ের মধ্যে এটা লাভ করেছি, অন্তত তার আটগুণ সময় বে-ফালতু নষ্ট করেছি। যেটা আমার ও অন্যের জন্যে ব্যবহার করলে তাদের সঙ্গে আমার জীবনের সমৃদ্ধি আরও বাড়তো।

দৈনিক আজাদ
৬. ৩. ৭৭

'আল্লাহ্ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন।' এটা শুধু ইসলামের অবশ্য গ্রহীতব্য একটা নীতিবাক্য নয়; প্রত্যেক ধর্মে ও দেশে এটা মোটামুটি একটি আপ্তবাক্য হিসেবে গৃহীত হয়ঃ 'ইট ইজ অল ফর দ্য বেস্ট।'

আমার মত লোকের কাছে মনে হয় এটা অভ্রান্ত সত্য। আমার মত লোকের কাছে, মানে যে আল্লাহ্র বিধানে বিশ্বাসীই শুধু নয়; তর্ক-বিচার দ্বারা সেটাকে মনের কাছে গ্রহণযোগ্য করতে পারে এমন লোকের কাছে এটা আপ্তবাক্য হিসেবে অবলম্বনীয়।

মোটের উপর আল্লাহ্র বিধান সব ক্ষেত্রে মেনে নেয়ার জন্যে মননই শুধু নয়, বুদ্ধি থাকাও প্রয়োজন। যতদূর মনে পড়ে বোধ-হয় শেখভ-ই এই ধরনের একটা কথা বলেছেনঃ যদি কোন দুর্ঘটনায় তোমার হাত কাটা যায় তা হলে তুমি এই বলে খুশী হতে পার যে, তুমি তাতে মারাও যেতে পারতে। অবশ্য এ রকমভাবে বিচার করার জন্যে মননশীলতাই হলো প্রধান, যদিও সেই মননশীলতার ভিত্তি হয় আল্লাহ্র বিধানে একান্ত বিশ্বাসের উপর।

ধরুন, কাজী নজরুল ইসলামের কথা। এই যে তিনি প্রায় চৌত্রিশ বছর ধরে একটা অস্পষ্ট মানসিক-গোধূলি অবস্থার মধ্যে কাটালেন, এই যে তাঁকে সদ্য স্বাধীন হওয়া বাঙলাদেশে নিয়ে আসা হলো; এই যে তাঁকে নিজ পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কিন্তু সকলের মধ্যে সমাচ্ছন্ন থেকে ঢাকাতে বাস করতে হলো, এই যে তিনি বাংলা-দেশের নাগরিকত্ব এবং সরকারীভাবে সর্বাপেক্ষা বড় সম্মান পাওয়ার পরপরই রমযান মাসে মৃত্যু বরণ করলেন এবং এই যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জামে মসজিদের পার্শ্বে তাঁর কবর দেয়া হলো, এ সবের মধ্যে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে আল্লাহ্র একটা মহৎ উদ্দেশ্য পালিত হয়েছে।

৯—

কি ক'রে? আমার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে যে রকম বুঝেছি, সেই রকম বলছি ঃ

কাজী নজরুল ইসলামকে আল্লাহ্ ঐ অস্পষ্ট মানসিক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কেন বাঁচিয়ে রাখছেন, এ প্রশ্ন সব সময়ে আমার মনে উঠতো এবং বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন উত্তর আমি মনের মধ্যে পেতাম। এবং তার শেষ উত্তর এই, যে কথাগুলো আমি এইমাত্র উল্লেখ করলাম, তার বিশ্লেষণের মধ্যে আমি পেয়েছি।

আল্লাহ্ নজরুলকে ঐ অবস্থায় কেন বাঁচিয়ে রাখছেন প্রথমে আমার যে কারণ মনে হতো সেটা হলো, তিনি হয়তো তাঁকে আবার তাঁর ভাষা ও কণ্ঠ ফিরিয়ে দেবেন এবং বিস্মৃত বছরগুলির কোন একটা দুর্দাম প্রতিক্রিয়া তাঁর পরবর্তী লেখাগুলোয় প্রকাশ পাবে। কিন্তু তা হচ্ছিল না, তাঁর শেষের সবাক দিনগুলির উচ্ছলতা ক্রমেই স্তিমিত হয়ে যাচ্ছিল। এর মধ্যে পাকিস্তান হলো। নজরুলকে আমরা কবি ইকবালের বিকল্প হিসেবে পেলাম যেন। চললো নজরুল চর্চা ও গান। পূর্ব পাকিস্তান নজরুলময় হয়ে উঠলো এবং সারা পাকিস্তানে নজরুলের প্রতিষ্ঠা এমন হলো যে, নজরুলকে ভুলে যাওয়া পশ্চিম বাঙলায়ও তার কিছু শুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এ সবই হলো সত্যি। কিন্তু আল্লাহ্র কি উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে বাঁচিয়ে রাখার? নজরুল যদি বুঝতে পারতেন তা'হলেও না হয় মনে করা যেত যে তাঁকে আল্লাহ্ সেই জন্যেই বাঁচিয়ে রাখছেন। দেশ বিভাগের পূর্বে নজরুলকে আমরা যেরূপ পেয়েছিলাম তার শতগুণ মর্যাদা সহকারে আমরা তাঁকে সম্মান দেখাতে লাগলাম। কিন্তু তাতে তাঁর বেঁচে থাকার কি কোন প্রয়োজন ছিল? উত্তর মিললো না।

বাঙলাদেশ স্বাধীন হলো। তাঁকে নিয়ে আসা হলো, তাঁর পরিবারবর্গ তাঁর সঙ্গে থাকলেন, তাঁর ভক্তগণ তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে লাগলেন। তাঁর ঐ মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও তিনি হয়তো সর্বপ্রথম এই সম্মানের নিদর্শন উপভোগ করতে পারছিলেন। কারণ, তাঁর কলকাতাবাসের সময় এ ধরনের দৃশ্যের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই ছিল না। সুতরাং তাঁর বেঁচে থাকার কিছু হয়তো কারণ পাওয়া গেল। কিন্তু তাঁর পরিবারবর্গ একে একে তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন, তিনি একাই রইলেন। তখন মনে হলো আল্লাহ্ যেন এটাই

চাইছিলেন। নজরুল ছিলেন দরদী কবি, পরিবেশ তাঁকে অদ্ভুতভাবে টানতো; হিন্দু পরিবেশে হিন্দুয়ানী, মুসলিম পরিবেশে মুসলমানী, দেশের সংগ্রামী পরিবেশে অগ্নিময় কবিতা তাঁর বেরিয়ে আসতো অনর্গল। ভালবাসার পরিবেশে মন আপ্লুত করার মত কবিতা। সবচেয়ে যে পরিবেশ নজরুল পছন্দ করতেন বেশী সেটাই তাঁর জন্যে যেন আল্লাহ্ রেখে দিলেন। লোকের প্রাণভরা শ্রদ্ধা নিবেদনের পরিবেশ। ব্যস, এইটুকু হদিস পাওয়া গেল তখন পর্যন্ত।

একটা কথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে—নজরুলের ইসলামী গান মুসলমানকে যে পরিমাণ উদ্দীপ্ত করতো এবং উত্তরোত্তর উদ্দীপ্ত করে যাচ্ছে, দেশপ্রেমের যেসব গান হিন্দু-মুসলমানকে উদ্দীপ্ত করতো ও করছে, তাঁর হিন্দু ধর্মসংক্রান্ত গান সে পরিমাণ হিন্দুদের উদ্দীপ্ত করে নি এবং করছেও না। সেগুলো বড় জোর একজন মুসলমান, কি পরিমাণ হিন্দুদের ধর্ম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তার একটা আনন্দদায়ক প্রমাণ হিসেবে তারা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে নির্জলা একটা মুসলিম পরিবেশই যেন আল্লাহ্ তাঁর জন্য চাইছিলেন। এই সঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, আপনারা যারা অন্যের ধর্ম নিয়ে চর্চা করেছেন, তারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন প্রত্যেক ধর্মেই এমন সব জিনিস রয়েছে যা সেই ধর্মাবলম্বীর কাছে অপূর্ব লাগার কথা, যদি না তিনি এই লাগার দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল আখ্যায় আখ্যায়িত হতে ভয় পান। এবং অন্যদেরও সেগুলো ভালো লাগবে। আর এই ধর্ম যদি সত্যিকার একেশ্বরবাদের হয় তা হলে তার মানবিক নীতিগুলোতে দেখা যাবে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। সুতরাং সত্যিকার মুসলমানের কাছে অন্য ধর্মের মানবিক আবেদন খুব কাজ করে। আমি যখন হিং টিং ছট-এর লেখাগুলো লিখতাম তখন হিন্দুশাস্ত্র এতদূর পড়েছিলাম যে, আমার কথাগুলোর মধ্যে আশ্রমের একটা দরদপ্রসূত গুরুগম্ভীর ও পুণ্যভাব বজায় থাকতো, যার জন্যে হিন্দু শ্রোতাদের কাছ থেকেও বহু প্রশংসাযুক্ত চিঠি পেয়েছি। যদিও ঐ ধরনের লেখা আমাকে খুব আনন্দ দিত, তবুও তার সঙ্গে আমি একাত্ম-বোধ কখনো করতে পারিনি। আমি নজরুলের হিন্দু-ধর্মসংক্রান্ত গানকেও তাই মনে করি। তিনি তার সঙ্গে কখনো একাত্ম হতে পারেন না। যেমন ধরুন কোন হিন্দু কবি সাহারাতে ফুটলো রে ফুল যদি

লিখতেন তা হলে সেটা অপূর্ব হলেও তাকে তার সঙ্গে একাত্ম ধরা যেত না।

নজরুল নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র একান্ত প্রিয় ব্যক্তি ছিলেন, আল্লাহ্‌, রসুল ও ইসলামী তরবিয়তের দিকে মানুষকে যদি কেউ দুর্দান্তভাবে চালিয়ে দিয়ে থাকেন তবে বাঙলাদেশে সব চাইতে সোজা উপায়ে গানের মধ্যে পাগল করে নজরুল চালিয়ে দিয়েছিলেন। সব চাইতে বড় ইবাদত তিনি গানে পরিবেশন করেছিলেন, ইনিয়ে বিনিয়ে কিছু আল্লাহ্‌কে বলতে হয় না, গানের সুরে মানুষের আবেদন বুক চিরে বেরিয়ে যায় আল্লাহ্‌র কাছে। সেই নজরুলকে আল্লাহ্‌ শুধু ক্ষমা করার কারণেই মনে হয় এই অবস্থায় ফেলেছিলেন। হযরত আইউব আলাই-হিস সাল্লামকে তিনি কুষ্ঠ রোগ দিয়েছিলেন, হযরত ইউনুস আল্লায়হিস-সাল্লামকে মাছের পেটে ফেলেছিলেন। তাঁদেরকে সে অবস্থায় ফেলেছিলেন ইবাদত করার জন্যে, যে ইবাদতের পর তাঁরা মুক্তি লাভ করেছিলেন।

সুতরাং আল্লাহ্‌র যদি কেউ প্রিয় হন, এবং তিনি বিপথে চলে গিয়ে থাকেন, তাহলে তাকে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করার জন্যে এই অবস্থায় ফেলেন। নজরুলকেও হয়তো তাই ফেলেছিলেন। ধরা যেতে পারে, বিভ্রান্তিকর এতদিনের সব পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বাকশক্তি রহিত করে একান্তভাবে তাঁকে মনে করার জন্যেই করেছিলেন। নজরুলের মনে যে ধর্মাবেগ সব সময় দেখা গেছে সেটা মূলত ইসলামের। কে জানে, এই সময় তিনি সেটাই নীরবভাবে আল্লাহ্‌র কাছে পেশ করে গেছেন কি না।

নজরুলের মৃত্যুও তেমনি হয়েছে সব চেয়ে ভালো সময়। অর্থাৎ তাঁকে নাগরিকত্ব ও একুশের পদক প্রদান করার পর। তাঁকে যেন আল্লাহ্‌ সেই জন্যেই বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তিনি যদি তার আগে মারা যেতেন তা হলে কি হতো, তার মৃতদেহকে হয়তো কলকাতা পাঠাতে হতো। সুতরাং এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে তার কবর, যেমন তিনি তাঁর একটি কবিতায় (গানে) আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন, তেমনই যে দেয়া হয়েছে এবং সেখানে তাঁর কবর দেওয়াতে সব সময়ে চোখের উপর থাকার ও মনে করার মত তার আকাঙ্ক্ষিত যে সম্মানজনক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে তা হতো না। ভারতে এ ধরনের পরিস্থিতি তাঁর জন্যে কল্পনা করাও যেত না। এই যে বাঙলাদেশের নাগরিকত্ব

পাওয়ার পর তিনি মারা গেলেন, তাতে এই হলো যে, তিনি একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষার জাতীয় কবি হিসেবে বেঁচে থাকবেন। ভারতে থাকলে তিনি বড় জোর একটি আঞ্চলিক ভাষার মুসলমান কবি বলে গৃহীত হতেন। আমাদের বাঙলাদেশের লাভ হলো এই, আমরা তাঁকে আমাদের নিজস্ব কবি হিসেবে আমাদের মাটিতে চিরকালের জন্যে পেলাম। তাই বিদেশ থেকে শোকবার্তা আমাদের কাছেই আসছে। সুতরাং ধরা যায়, আমাদের জন্যে এই সৌভাগ্য আল্লাহ্ সূচিত করবেন বলেই তিনি এতদিন বেঁচে ছিলেন এবং নাগরিকত্ব দেয়ার পর শুধুমাত্র ততদিন বেঁচেছিলেন, যাতে মরার জন্যে রোযার মাসটা পাওয়া যায়। নজরুল সত্যিই সৌভাগ্যবান, আল্লাহ্‌র খাস রহমত তিনি পেয়েছিলেন। সেই জন্য বললাম, আল্লাহ্ যা করেন ভালোর জন্যেই করেন। এবং নজরুলের ভালোর জন্যই যে তা করেছিলেন তা নজরুলের শেষ জীবন পর্যায়ে প্রমাণিত হয়েছে।

দৈনিক আজাদ
১৯.৯.৭৬

ইসাফেরা ঢাবু—১৯৮১-৮২—৫৭—৩০.৬.১৯৮২